ক্রুসেড-২২

হেমসের যোদ্ধা

আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ২২

হেমসের যোদ্ধা

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ক্রুসেড - ২২
হেমসের যোদ্ধা

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮, মোবাইল: ০১৭১৭৪৩১৩৬০

পঞ্চম মুদ্রণ : জানুয়ারী ২০১২
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস
মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-22
Hemser Zudda
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz

Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Mobil : 01717431360
5th Editition: January 2012
Published on: Jun 2004

PRICE : 50.00 TAKA

ISBN 984-581-228-7

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর শহর-গ্রামে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর সে স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

✡ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✡ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ✡ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✡ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✡ ভয়াল রজনী ✡ আবারো সংঘাত ✡ দুর্গ পতন ✡ ফেরাউনের গুপ্তধন ✡ উপকূলে সংঘর্ষ ✡ সর্প কেল্লার খুনী ✡ চারদিকে চক্রান্ত ✡ গোপন বিদ্রোহী ✡ পাপের ফল ✡ তুমুল লড়াই ✡ উমরু দরবেশ ✡ টার্গেট ফিলিস্তিন ✡ গাদ্দার ✡ বিষাক্ত ছোবল ✡ খুনী চক্রের আস্তানায় ✡ পাল্টা ধাওয়া ✡ ধাপ্পাবাজ ✡ হেমসের যোদ্ধা

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৩

ইহুদী কন্যা

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।
তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের
কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ–
'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের সাতটি বই

আতংকিত নানকিং ✡ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ✡
ব্ল্যাক আর্মির কবলে ✡ হাইনান দ্বীপে অভিযান ✡
অশান্ত চীন সাগর ✡ বিধ্বস্ত শহর ✡ ড্রাগনহিলের
বিভীষিকা

অচিরেই বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের পরবর্তী বই

মৃত্যু দ্বীপ

জাভীরা। শত হোক, সে এক মেয়ে বৈ তো নয়! একটার পর একটা ভয় ও আতংকের স্রোত জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেলে কয়টার মোকাবেলা করবে সে? পাহাড়ে ধ্বস নামলে যেমন ছোট-বড় অসংখ্য পাথর অনবরত ছুটে আসতে থাকে, তেমনি একটার পর একটা বিপদ ক্রমাগত ছুটে আসতে লাগল তার দিকে। সেই বিপদ দেখে ভয়, শংকা ও ত্রাসের স্রোতে হাবুডুবু খেতে লাগল জাভীরা।

জাভীরার ঝড়ের আতংক হারিয়ে গিয়েছিল প্লাবনের বিভীষিকা দেখে। প্লাবনের ভয় হারিয়ে গেল যখন অচেনা বিধর্মী যুবকের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয় এসে তাকে জাপটে ধরলো। সর্বনাশা স্রোত কেড়ে নিয়েছে তার উট। তার নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব ছিল যাদের, কাফেলার সেই সঙ্গীরা হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। যে গোপন ও ভয়ংকর অভিযানে যাচ্ছিল ওরা, এখন সে অভিযানের কি হবে? কেমন করে কাদের নিয়ে সেই অভিযান সফল করবে জাভীরা?

এ সব দুশ্চিন্তা যখন ওকে দিশেহারা করে তুলছিল তখনি সেই অচেনা বিধর্মী যুবকের কাছ থেকে তার কাছে এলো নির্ভরতার আশ্বাস। সেই আশ্বাস ও ব্যবহার তাকে বলছিল, 'আতংক দূর করে দাও মেয়ে। একজন মুমীন কখনো অসহায় নারীর জন্য ভয় ও ত্রাসের কারণ হতে পারে না। বরং পৃথিবীর সকল

অসহায় মানুষের আশ্রয় ও সহায় হয়ে দেখা দেয় একজন ঈমানদার। অতএব ভয়ের জগত থেকে বেরিয়ে এসে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখো। ভুলে যেওনা, এই মুসলমানরা এমন সমাজ নির্মাণ করতে পারে, যেখানে মরুভূমির দুর্গম পথে কোন নারী একাকী শত শত মাইল পাড়ি দিতে পারে সম্পূর্ণ শংকাহীন চিত্তে। এটাই ইতিহাস, এটাই সত্য এবং বাস্তবতা।'

কিন্তু জাভীরা ভাবছিল, 'এতই কি সহজ ভয় শূন্য হওয়া! একজন মানুষ বলল, তুমি ভয় শূন্য হয়ে যাও আর তাতেই ভীত লোকটির অন্তর থেকে সব ভয় পালিয়ে যাবে? মানুষ কি এতই বিশ্বাসযোগ্য? এই আশ্বাসের মধ্যে প্রতারণা নেই, ছলচাতুরি নেই, কে এমন নিশ্চয়তা দেবে?'

যুবকের আশ্বাস পেয়ে ভাবছিল জাভীরা, 'আমার অন্তর কি এই যুবকের ভালমানুষী চেহারা দেখে সত্যি সত্যি ভয় শূন্য হতে পেরেছে?' না, বরং সে অনুভব করলো, ভয় ও আতংকের একটার পর একটা ঢেউ এখনো আছড়ে পড়ছে তার জীবনে।

মুসলিম যুবকের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয় কেটে যেতেই অন্য ভয় এসে বাসা বাঁধলো তার মনে। এমন কি হতে পারে না, লোকটি বড় অর্থলোভী? অনেক টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়ার মানসেই এ যুবক আমাকে এভাবে আগলে রাখছে? এ কথা মনে হতেই জাভীরার মন বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরবর্তী জীবনের কথা ভেবে শিউরে উঠল। সেই অনাগত ও অনিশ্চিত জীবনের পদে পদে সে অনুভব করলো হাজারো বিপদ তার

জন্য ওঁৎ পেতে আছে।

দুর্যোগের রাতটি তারা কাটিয়ে দিল পাহাড়ের এক গুহায়। জাভীরার মনে পড়লো, রাতে যুবককে হত্যা করার একটি ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল সে। কিন্তু অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল যুবক।

জাভীরার হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর চরম উৎকণ্ঠা পেয়ে বসেছিল তাকে। ভেবেছিল, এ রাতই তার জীবনের শেষ রাত। আর কোন দিন সে এ পৃথিবীর আলো বাতাস দেখতে পাবে না। কাল ভোরেই তার এ সুন্দর দেহ আর কমনীয় শরীর খুবলে খাবে শেয়াল শকুন।

খুনীকে কি কেউ ক্ষমা করে? কেন করবে? তাকে বাঁচিয়ে রাখার কি দায় ঠেকেছে এই মুসলিম যুবকের? যে মেয়ে একবার তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, সুযোগ পেলে সে মেয়ে আবার তাকে খুন করার চেষ্টা করবে না, এমন নিশ্চয়তা তাকে কে দিয়েছে? যুবকের নিরাপত্তার সহজ পথ হচ্ছে প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ করে দেয়া। যুবকটি কি শেষ পর্যন্ত তাই করবে?

এ প্রশ্ন মনে উদয় হতেই মৃত্যু ভয় মেয়েটির চেহারা আবার বিবর্ণ করে দিল। জাভীরা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, 'মরতে যদি হয়-ই তবে এ যুবককে ছেড়ে দিয়ে লাভ কি! ওকে সঙ্গে নিয়েই আমি মরবো।'

তানভীরকে খুন করার অদম্য ইচ্ছা ও বাসনা নিয়েই জাভীরা চুপচাপ বসেছিল গুহার ভেতর। কিন্তু কখন ঘুম এসে তাকে কাবু করে ফেলল সে টের-ই পায়নি। যখন ঘুম ভাঙল, তখন

সকাল হয়ে গেছে।

পাহাড়ের গুহায় সেই মুসলিম যুবকের সাথে তার প্রথম রাতটি শেষ হয়ে গেল। ভোরে যখন তার ঘুম ভাঙল সে এই ভেবে অবাক হলো, যুবক তানভীর তাকে তো খুন করেইনি, এমনকি তার এমন আকর্ষণীয় দেহ এবং লোভনীয় শরীরের প্রতিও কোনরূপ খেয়াল করেনি। এ কি কোন নির্বোধ আহাম্মক! নাকি অনুভূতিহীন কোন কাপুরুষ! তানভীরের কাণ্ড দেখে এ প্রশ্নটাই প্রথম তার মনে জাগলো।

•

পূর্বাকাশে রাঙা সূর্য উঠল। সূর্যের রোদ গুহায় ঢুকল না বটে, তবে তার আলোয় গুহা এবং তার আশপাশের এলাকা আলোকিত হয়ে উঠলো। ভোরের সেই স্নিগ্ধ আলোর দিকে তাকিয়ে চেতনার কোন অতল তলে হারিয়ে গেল জাভীরা, সে নিজেও তা টের পেলো না। ভোরের সেই স্নিগ্ধ আলোর দিকে তাকাতেই তার সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ ও অচেনা যুবকের লাঞ্ছনার ভয় সব যেন দূর হয়ে গেল। এতক্ষণ সে যাকে অনুভূতিহীন এক কাপুরুষ যুবক মনে করছিল, সেই যুবকের দিকে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জাভীরা।

তানভীরের ঠোঁট নড়ছে। জাভীরার মনে হচ্ছে, এ লোক সরাসরি আল্লাহর সাথে আলাপ করছে। জাভীরার মনে পড়লো, তানভীর বলেছিল, খোদা শুধু তাকেই সাহায্য করেন, যার নিয়ত ও মন পবিত্র। তাহলে কি এই সে পবিত্র লোক! নাকি এ লোক মানুষ নয়, কোন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসেছে তাকে বাঁচাতে! এ সব ভাবতে ভাবতে জাভীরার

অসীম মুগ্ধতা আছড়ে পড়লো তানভীরের সেই প্রার্থনারত ঠোঁটের ওপর।

নিজের জীবনের কথা মনে পড়লো তার। ভেবে দেখলো, নিজের দেহটাই কেবল অপবিত্র নয়, অপবিত্র তার ইচ্ছা এবং নিয়তও। তাই তো তানভীরের মত সুন্দর যুবকদের প্রতারিত করার চেষ্টাতেই কেটে যায় তার সকাল ও সন্ধ্যা!

জাভীরা রাতে এটাও চিন্তা করে রেখেছিল, যদি কোন অলৌকিক কারণে সে যুবককে হত্যা করতে না পারে বা যুবকের হাতে সে নিহত না হয় তবে সে যুবকটিকে রূপের ফাঁদে আটকে ফেলবে। যদি সকাল পর্যন্ত যুবক নিজে তার রূপের সাগরে ঝাঁপ না দেয় তবে সকালে সে নিজেই উদ্যোগ নেবে যুবককে তার প্রেমের শেকলে বন্দী করার। সে তার রূপ ও যৌবন যুবকটিকে দান করে বলবে, 'এর বিনিময়ে আমাকে হেমসে পাঠিয়ে দাও।'

জাভীরা জীবনে এই প্রথম তার সংকল্প পরিত্যাগ করলো। সে অনুভব করলো, তার সাথে কেবল একটা শরীর নয়, আত্মা এবং বিবেকও আছে। যদিও সে আত্মা পাপ পংকিলতায় ভরা, কিন্তু আত্মার তো একটা মানবিক চাহিদাও আছে! বিবেক তো সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। এই যুবক যে মহত্ব ও মহানুভবতা দেখালো তা তো মিথ্যে নয়!

জাভীরা নিজের জীবন ও আচরণের কথা মনে করে খুবই লজ্জা অনুভব করতে লাগলো। তানভীরকে এখন সে আর দশজন মানুষের মত কোন সাধারণ মানুষ ভাবতে পারছে না। তার দৃষ্টিতে সে এখন ফেরেশতার মত মহান। সে তাদেরই

একজন, যে মানুষ স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে।

মেয়েটি এসব ভাবছিল আর তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। যতই তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল ততই সে অনুভব করছিল, তার হৃদয়ের পাষাণভার হালকা হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল, তানভীরের অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারলেই সে পরিপূর্ণ শান্তি ও তৃপ্তি পাবে।

নামাজ শেষে তানভীর দোয়ার জন্য হাত উঠালো। তার ধারণা ছিল, জাভীরা ঘুমিয়ে আছে। এই নির্জন কক্ষে সে ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। তাই সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, 'হে মহান প্রভূ! তুমি আমাকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র রাখো। আমাকে পবিত্র থাকার চেতনা ও ক্ষমতা দান করো। আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখো এবং যে আমানত তুমি আমার হাতে সোপর্দ করেছো খেয়ানত ছাড়াই তাকে ঠিকানায় পৌছে দেয়ার শক্তি দাও। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সেই ভয় পয়দা করে দাও, যে ভয় এক সুন্দরী যুবতীর রূপ ও যৌবনের প্রলোভনকে উপেক্ষা করে তোমার পথে টিকে থাকতে পারে। প্রভু হে, আমি তোমার এক অবুঝ ও দুর্বল বান্দা। তুমি আমাকে সেই শক্তি দান করো, যেনো আমি শয়তানের শয়তানী ও কুমন্ত্রণার সাথে লড়াই করে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার মর্যাদা রক্ষা করতে পারি।'

তানভীর ফেরেশতা নয়, সে মানুষ। মানুষের কুপ্রবৃত্তি, লোভ লালসা, মোহ, দুর্বলতা সবই তার মধ্যে ছিল। কিন্তু ঈমান এমন এক জিনিস, যা মানুষকে এসব দুর্বলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আল্লাহর ভয়, পরকালের ভয় মানুষকে পশুত্ব ও

বর্বরতা থেকে রক্ষা করে। এই মোনাজাতের মধ্য দিয়ে তানভীর সেই শক্তিই সঞ্চয় করছিল। সততা ও দায়িত্বশীলতার বর্ম দিয়ে আবৃত করছিল নিজেকে।

দোয়া শেষ করে প্রশান্ত মনে উঠে দাঁড়াল তানভীর। ঘুরে জাভীরার দিকে তাকাতেই দেখলো, জাভীরা নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

কি কারণে মেয়েটি কাঁদছে জানে না তানভীর। সে কি পিতৃ হারানোর শোকে! অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায়! যে কারণেই কাঁদুক, তানভীর ওকে বিরক্ত না করে চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

জাভীরাও তেমনি। অপলক চোখে কেবল তাকিয়েই রইলো, কোন নড়াচড়া করলো না। কোন কথাও বললো না।

একটু পর। তানভীর জাভীরাকে বললো, 'বাইরে যাও। বাইরে পরিষ্কার পানির ঝরনা আছে, তাতে হাত মুখ ধুয়ে এসো।'

তানভীর তার মাথায় জড়ানো পাগড়ি খুলে জাভীরার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'এটা নাও। ভাল করে মুখ-হাত ধোও। তোমার চুলে এখনো কাদামাটি লেগে আছে, ওগুলো পরিষ্কার করো। আমি তোমাকে তোমার সাবেক চেহারায় তোমার আত্মীয়দের হাতে তুলে দিতে চাই, যেমনটি তুমি দুর্যোগের আগে ছিলে।'

জাভীরা তার হাত থেকে কাপড়টা নিয়ে এমন ভঙ্গিতে বের হয়ে গেল, যেন কোন শিশু গুরুজনের আদেশ পালন করছে।

তানভীরের কাছে খাবার ও পানীয় যা কিছু ছিল সেগুলো ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা ছিল। এখন ঘোড়াও নেই, কোন খাবার বা পানীয়ও নেই। তাই সে চুপচাপ জাভীরার ফিরে আসার অপেক্ষায় বসেছিল।

জাভীরা ফিরে এলো। তানভীরের কথামত ভাল করে মাথা ও মুখমন্ডল ধুয়ে এসেছে সে। একটু আগে জাভীরার চুল মাটি ও কাদায় জট পাকিয়েছিল। চেহারার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। এখন শিশির ধোয়া ফুলের মতই সজীব ও প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে সে।

তানভীর জাভীরার এ রূপের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো, যেন তাকে চিনতেই পারছে না।

মনে মনে হোঁচট খেল সে। এ যেন যাদুর চমক। এত তাড়াতাড়ি মেয়েটি শোক ও কষ্ট কাটিয়ে এমন স্বাভাবিক ও পরিপাটি হতে পারবে, ভাবতেই পারেনি তানভীর।

পল্লী গ্রামের মানুষ সাধারণত এমন আকর্ষণীয় রূপ লাবন্যের অধিকারী নারীর দেখাই পায় না। কোন ধনীর দুলালীই কেবল এমন মায়াময় চেহারা ও এত আকর্ষণীয় দেহবল্লরীর অধিকারী হতে পারে। তানভীর জাভীরার এ রূপ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না।

তানভীর সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে বললো, 'আমাদের হাতে খাওয়ার মত কিছু নেই। খালি পেটেই আমাদের রওনা করতে হবে। তাই আর দেরী করতে চাই না। চলো বেরিয়ে পড়া যাক।'

সে উঠার উদ্যোগ করতেই জাভীরা দু'কদম এগিয়ে তার

সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আর একটু বসো। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই, কিছু জানতে চাই তোমার কাছে।'

তানভীর প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। বলল, 'বলো, কি জানতে চাও?'

'তুমি যখন তোমার আল্লাহর সাথে কথা বলছিলে, তখন কি তুমি তাকে দেখতে পেয়েছিলে?'

'আল্লাহকে মানুষের এই সীমিত দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় না।' তানভীর বললো, 'আমি আলেম নই, এ জন্য বলতে পারছি না, দেখা না দিয়ে আল্লাহ কেমন করে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। আমি শুধু এতটুকু জানি, আল্লাহ আমার সব কথাই শুনতে পান। তিনি আমার দোয়া শুনেছেন এবং আমার দোয়া কবুল করেছেন, তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি।'

'তোমার কি বিশ্বাস, চেষ্টা ও শক্তির বিনিময়ে তুমি ঝড় ও স্রোতের কবল থেকে রক্ষা পাওনি বরং তোমাকে ও আমাকে মহা দুর্যোগ থেকে আল্লাহই বাঁচিয়েছেন?' জাভীরা প্রশ্ন করলো।

'একশো বার।' দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তানভীর জবাব দিল, 'খতিব সাহেব বলেন, যত বড় বিপদই হোক, যদি কেউ মন থেকে আল্লাহর সাহায্য চায় তবে মহা বিপদ থেকেও আল্লাহ মানুষকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তার চাওয়া হতে হবে আন্তরিক ও নিষ্কলুষ।' তানভীর বললো, 'যদি আমি এই আশায় তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম যে, তোমার মত সুন্দরীকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবো, তবে কাল সেই প্লাবনের সয়লাবে তোমার সাথে আমিও ডুবে মরতাম।'

'কিন্তু আমার আত্মা তো পবিত্র নয়!' জাভীরা দুঃখভরা কণ্ঠে বললো, 'আমাকে আল্লাহ্ কেন সাহায্য করবেন? আমাকে কেন বাঁচাবেন?'

'এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহই ভাল জানেন। তবে হেমসে গিয়ে খতিবকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি তিনি এর কোন জবাব জানেন কিনা?' তানভীর বললো, 'আমার মধ্যে এত এলেম নেই যে, তোমাকে আল্লাহর সব মহিমা বুঝাতে পারবো।'

'এই প্রশ্নের জবাব না হয় খতিবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। কিন্তু এটা তো বলতে পারবে, আমার মত যুবতীর এমন নজরকাড়া সৌন্দর্য আর লোভনীয় রূপ দেখেও কেমন করে তুমি এমন নির্লিপ্ত থাকতে পারলে? কেন থাকলে?' জাভীরা প্রশ্ন করলো।

'তুমি যা বলতে চাইছো যদি আমি তাই করতে চাইতাম, তবে আমি তোমার খঞ্জরের আঘাত থেকে বাঁচতে পারতাম না। আল্লাহ্ আমাকে হেফাজত করার জিম্মা নিতেন না।' তানভীর উত্তরে বলল, 'তুমি আমার কাছে আল্লাহর এক পবিত্র আমানত। মুসলমান রিপুর তাড়নায় আমানতের খেয়ানত করতে পারে না।'

তানভীর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। হঠাৎ সে তার চোখ নামিয়ে নিল এবং চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'তুমি বড় বিপজ্জনক আমানত জাভীরা! তোমাকে নিয়ে আমি বড় ভয়ের মধ্যে আছি। তোমার হেফাজতের চিন্তায় আমি এমনিতেই অস্থির, দয়া করে আমাকে আর পেরেশান করো না। চলো এখন

যাই।'
সে অধীর হয়ে উঠতে চাইলো কিন্তু জাভীরা তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আরেকটু বসো। আমাকে বলো, আমাকে নিয়ে তোমার কিসের ভয়? তুমি কি ভাবছো আবার আমি তোমাকে আক্রমণ করবো?'
'তাহলে তো বেঁচে যেতাম।' তানভীর বললো, 'তোমার শত্রুতা আমার জন্য বিপদের নয়, বিপজ্জনক হচ্ছে তোমার বন্ধুত্ব, তোমার সঙ্গ। আমাকে তোমার পাশে আর বেশীক্ষণ এভাবে আটকে রেখো না। আমি ফেরেশতা নই জাভীরা, আমিও মানুষ। আমাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলো না, যে পরীক্ষায় ফেল করলে আমার দুনিয়া আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে। আমাকে আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করতে দাও। তার রহমত থেকে আমাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করো না।'
'তোমার আল্লাহর কসম!' জাভীরা বললো 'আমাকেও তোমার মত বানিয়ে নাও। তোমার আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়ার যোগ্য করে দাও আমাকে। তুমি কোন সাধারণ মানুষ নও, তুমি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উপরে। তুমি খোদার দূত! আমি জানি আমি ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু যারা মহান তাদের ক্ষমার শক্তি যে আমার পাপের চেয়েও বিশাল।' জাভীরা কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।
'তুমি কাঁদছো! কেন জাভীরা, কি জন্য কাঁদছো তুমি?' জাভীরার কান্না দেখে অস্থির কণ্ঠে বলল তানভীর।
'আমি জঘন্য খারাপ মেয়ে, আমি পাপিষ্ঠা।' জাভীরা বললো,

'আল্লাহ আমার প্রতি দারুণ অসন্তুষ্ট। যখন স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিচ্ছিল, তখনও আমার অন্তরে আল্লাহর কথা জাগেনি। আমি আমার দেহ-সম্পদের জন্য গর্ব করতাম। জানতাম, আমার দেহে আছে অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ আমি রাজরাণী। এই দেহটাকে বাঁচাতে গিয়ে যখন আমি ব্যর্থ হলাম তখন তুমি এই দেহের ভার নিলে। আমাকে উদ্ধার করে আনলে সেই দুর্যোগের মধ্য থেকে। তাই ভয় পাচ্ছিলাম, যে কোন সময় এ দেহ তুমি দাবী করে বসতে পারো। এ ভয়েই আমি তোমাকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করেছিলাম। কারণ এ দেহই ছিল আমার শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম। স্বাভাবিকভাবেই এ ব্যর্থতার পর তুমি আমার জীবন ও দেহ চেয়ে বসলে আমার কিছুই করার ছিল না। কিন্তু তোমার আচরণ থেকে জানতে পারলাম, দেহটা মানুষ নয়, মানুষের খোলসমাত্র। আসল মানুষ বিরাজ করে অন্তরে। অন্তরের সেই মানুষ মারা গেলে দেহ হয়ে যায় নিথর লাশ। তাহলে যাকে আমি অমূল্য সম্পদ জ্ঞান করতাম তা নিছক লাশ বৈ তো নয়! আমি কত মুর্খ দেখো, সামান্য একটা পচনশীল লাশের গর্বে মাটিতে আমার পা পড়তো না। কিন্তু যখন তোমার প্রার্থনা শুনলাম, তখন বুঝলাম আমি কত বড় আহাম্মক! বুঝলাম, আমি বা তুমি কিছু নই, আমাদের অতীত আমাদের নয়, বর্তমান আমাদের নয়, ভবিষ্যতও আমাদের নয়। আমরা আমাদের রক্ষা করতে জানি না। এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের জীবন। কিন্তু সেই শক্তি কি? কোথায়

এবং কেমন করে সেই শক্তির নাগাল পাবো আমি?'
'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষক। এ ক্ষমতা কেবল তার হাতেই নিবদ্ধ। তোমার আত্মাকে পবিত্র করো, এ শক্তি তোমার হয়ে যাবে।'
'কিন্তু আমার সারাটা জীবন কেটেছে পাপের মধ্যে, কেমন করে আমি পবিত্র হবো?'
তানভীর তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে পরিষ্কার করে বলো, তুমি কি নর্তকী? তুমি কি কোন আমীরের হেরেমের রাণী? নাকি তুমি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের দুলালী, জমিদারের সোহাগী কন্যা? শুনেছি এমন সব মেয়েরা খুব রূপসী হয়। তোমার মত সুন্দরী মেয়ে আমি এ জীবনে কোনদিন দেখিনি।'
জাভীরা চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনছিল তার কথা। তানভীরের কথা শুনে তার চোখে অশ্রু এসে গেল। সে তানভীরের আরো কাছে সরে এলো। তাকে ঘনিষ্ট হতে দেখে তানভীর একটু দূরে সরে গেল। জাভীরা বললো, 'তানভীর, আমার খুব ভয় করছে! তুমি জানো না, সেদিন ঝড়ের রূপ ধরে আমাকে গ্রাস করতে এসেছিল আমার পাপ! তোমার পবিত্র হাতের ছোঁয়া পেয়েছিলাম বলে সে যাত্রা বেঁচে গেছি। দোহাই তোমার, আমাকে বাঁচাও। তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দিও না। ঝড়ের সময় যেভাবে আমাকে আগলে রেখেছিলে সেভাবে আমাকে আকড়ে ধরে রাখো।'
'না!' তানভীর সচকিত হয়ে বললো, 'তুমি এভাবে আমার ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করো না। এতে যে কোন সময় আমি

বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারি।'

'অ, বুঝেছি। আমি পাপী বলে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছো, যেন বিপথগামী হয়ে না যাও। স্বীকার করছি, আমি অনেক লোককে বিপথগামী করেছি। কিন্তু তখন পাপ ও পূণ্যের কোন বোধ আমার মধ্যে ছিল না।'

জাভীরা লক্ষ্য করলো, তানভীরের মধ্যে ঈমানী চেতনা প্রবল পরিমাণেই আছে, কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা নেই। এ ধরনের লোককে বিভ্রান্ত করা খুব কঠিন কিছু নয়। জাভীরা জানে, যদি এ ধরনের লোককে একবার বিভ্রান্ত করা যায় তবে তারা সহজে সেই বিভ্রান্তি থেকে বেরোতে পারে না। আর যদি তাদেরকে কোন ছাঁচে ঢেলে সাজানো যায় তবে তারা সে ছাঁচেই চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

জাভীরা তার সাথে খোলাখুলি কথা বলা শুরু করে দিল। সে বলতে লাগলো, 'তানভীর, তুমি জানো এ জগত সংসারে এখন আমার কেউ নেই। একমাত্র সম্বল বাবাও মারা গেলেন ঝড়ের কবলে পড়ে। এখন আমি এক অসহায়া নারী। বাঁচতে হলে আমার একটি অবলম্বন দরকার। যদি আমি তোমাকে বলি, এসো আমরা সারা জীবন একসাথে কাটাই, পরস্পর জীবন সঙ্গী হয়ে যাই, তুমি কি উত্তর দেবে?'

তানভীর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মত একটু হাসলো। বললো, 'সে উত্তর জানার চাইতে আগে তোমার হেমসে পৌঁছা দরকার। চলো এখন যাওয়া যাক। রোদ বেড়ে গেলে পথ চলা মুশকিল হয়ে যাবে।'

এ জবাব ভাল না মন্দ জাভীরা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না।

সে তার সঙ্গে উঠে যাত্রা করলো।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে পথ চলছে ওরা। তানভীরের দৃষ্টি সামনে। জাভীরা বার বার তার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছে তাকে। গত রাতে এ তানভীরকেই হত্যা করে হেমসে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করেছিল সে। কিন্তু আজ? আজ দিব্বি তার সাথে দ্বিধাহীন চিত্তে হেমসের পথে হেঁটে যাচ্ছে।
তানভীর খুব দ্রুত হাঁটছিল। তার সাথে তাল মিলাতে কষ্ট হচ্ছিল জাভীরার। সে তানভীরের হাত ধরে বললো, 'এত তাড়া কেন, ধীরে চলো।'
'আমার আস্তে চলা উচিত নয়।' তানভীর বললো, নইলে আবার রাত হয়ে যাবে।'
'তা, রাত আসতে দাও না!' জাভীরা বললো, 'আমি এত দ্রুত হাঁটতে পারছি না।'
'চেষ্টা করো। যখন আর হাঁটতে পারবে না তখন আমি তোমাকে আমার কাঁধে উঠিয়ে নেবো, কিন্তু চলার গতি কমাতে পারবো না।' তানভীর বললো, 'আমার প্রচণ্ড তাড়া আছে।'

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ভাই তকিউদ্দিন খৃস্টান সম্রাট বিলডনকে হিম্মত দুর্গের বাইরে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। যার দরুণ হতভম্ব হয়ে বিলডনের সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ

হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। খৃস্টান সম্রাট বিলডন তার বিচ্ছিন্ন সেনাদলকে অতি কষ্টে একত্রিত করেন। একত্রিত করার পর তিনি বুঝতে পারলেন, তার কি পরিমাণ সৈন্য ক্ষয় হয়েছে।

তিনি দেখতে পেলেন, তার কাছে তখনো অর্ধেকের কিছু বেশী সৈন্য অবশিষ্ট আছে। তিনি এ বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন দামেশক পর্যন্ত দখল করতে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, তার প্রায় অর্ধেক সৈন্য তকিউদ্দিনের কমাণ্ডো বাহিনীর আক্রমণে মারা গেছে, নয়তো পালিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

সম্রাট বিলডন পলাতক সৈন্যদের অবস্থা জানতেন না। তারা তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে দিকবিদিক ছুটছিল। মুসলিম যাযাবর ও রাখালেরা ধাওয়া করছিল সেই পলাতক সৈন্যদের। এমনকি গ্রামের সাধারণ মুসলমান যুবক বুড়ো এবং ছেলে ছোকরার দল তাদের ধরে ধরে হত্যা করছিল। কেউ ছিনিয়ে নিচ্ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র, কেউ হস্তগত করছিল তাদের ঘোড়াগুলো।

সম্রাট বিলডন তার অবশিষ্ট সৈন্যদের একত্রিত করে হিম্মত দূর্গ থেকে কিছুটা দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নেয়ার হুকুম দিলেন। সেখানেই তিনি খবর পেলেন তার পলাতক সৈন্যরা বিচ্ছিন্নভাবে পালাতে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের হাতে নিহত হচ্ছে।

পরাজিত বিলডন পরাজয়ের কারণে এমনিতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে তিনি আরো দিশেহারা হয়ে গেলেন। রাগে উন্মত্ত হয়ে তিনি সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'যেখানেই মুসলমানদের গ্রাম ও

বস্তি চোখে পড়বে, সেখানেই নির্বিচারে লুটতরাজ চালাবে। সুন্দরী ও যুবতী মেয়েদের লাঞ্ছিত করবে। গ্রামের বাড়িঘর ও বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

আদেশ জারী করেই তিনি তার বাহিনীকে একদিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিলডনের পরাজিত বাহিনী ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হলো। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তারা পথে যেখানেই মুসলমান বস্তি ও গ্রাম পেলো সেখানেই লুটতরাজ চালাতে লাগলো।

মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করার পর সেই গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দিতো। গ্রামের নারীদের লাঞ্ছিত করতো এবং সুন্দরী ও যুবতী মেয়েদের অনেককেই ধরে নিয়ে যেতে লাগলো বাহিনীর সাথে। এতে মুসলিম জনসাধারণ তাদের উপরও মারমুখী হয়ে উঠলো। গ্রামের যুবক ও কিশোররা সেই বাহিনীর ক্ষতি সাধন করার জন্য জোট বেঁধে হামলা চালাতে লাগল। এভাবেই বিলডনের পরাজিত সৈন্যরা পথ চলছিল।

এক রাতে হেমস থেকে ছয় সাত মাইল দূরে এক জায়গায় গিয়ে রাত্রি যাপনের জন্য ক্যাম্প করলো ওরা।

বিলডন মনে মনে আশা করছিলেন, কোন খৃস্টান সম্রাট হয়তো তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। যদি তিনি বাইরে থেকে নতুন করে সৈন্য সহযোগিতা পান তবে তিনি ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তকিউদ্দিনের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে রুখে দাঁড়াবেন। তিনি আশা করছিলেন, আরেক বার তকিউদ্দিনের মুখোমুখি হলে নিশ্চয়ই তকিউদ্দিন ভড়কে যাবে। চাইকি দামেশ্‌ক পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তারের

পথও খুলে যেতে পারে।
রাতে ক্যাম্পে বসে এসবই তিনি ভাবছিলেন। তখনই তার মনে পড়লো সম্রাট রিনাল্টের কথা। সম্রাট রিনাল্ট ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এ যুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন। যদি সম্রাট রিনাল্টের সহযোগিতা পাওয়া যায় তবে তকিউদ্দিনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া তেমন কঠিন হবে না ভেবে তিনি রিনাল্টের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

জাভীরার কোন সন্ধান না পেয়ে নিরাশ হয়ে বৃদ্ধ খৃস্টান ও তার সাথীরা সারা রাত পথ চলে সকালে গিয়ে হেমসে পৌঁছলো। কাফেলার অন্যরাও হেমসে পৌছে গেলো ওদের সাথে। কিন্তু তাদের কারো কারো গন্তব্য ছিল আরো দূরে। তারা হেমসের বাসিন্দা ছিল না, ফলে তারা হেমসে না থেমে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জাভীরার সঙ্গীরা হেমসে তাদের ঠিকানায় গিয়ে উঠল। তানভীরের ঘোড়া তাদের সাথেই ছিল। তারা ঘোড়াটি এক মসজিদের ইমামের কাছে হেফাজত রেখে বললো, 'এ ঘোড়ার মালিক হেমসের এক যুবক। সে তুফানের মাঝে ঘোড়া থেকে পড়ে ডুবে গেছে। ঘোড়াটি কোন মতে বেঁচে গিয়ে নদীর কুলে উঠে এসেছিল। আমরা ঘোড়াটি ফেলে না রেখে নিয়ে এসেছি।'
মসজিদ থেকে ঘোড়া যখন তানভীরের বাড়ী পৌছলো, তখন সেখানে শোকের ছায়া নেমে এলো।

সেখানে এক ইহুদী বণিকের বাড়ী ছিল। ইহুদী বণিকটি ছিল ধনাঢ্য লোক। জাভীরার স্বঘোষিত বাবা বৃদ্ধ খৃস্টান তার সাথীদের নিয়ে সেই ইহুদীর বাড়ী গিয়ে উঠলো।

ইহুদী লোকটি তাদের সাদরে বরণ করে নিয়ে বলল, 'তোমাদের সাথে তো একটি মেয়ে আসার কথা, ও কোথায়?'

বৃদ্ধ শোক প্রকাশ করে আফসোসের সাথে বলল, 'জাভীরা উত্তাল স্রোতে ডুবে মারা গেছে।'

এ কথা শুনে সেই ইহুদী এবং উপস্থিত সকলেই আফসোস করলো। বৃদ্ধ লোকটি ইহুদীকে জিজ্ঞেস করলো, 'হেমসের মুসলমানদের অবস্থা কি? জেহাদের পক্ষে এখানে কেমন তৎপরতা চলছে?' ইহুদী এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগেই বৃদ্ধ আবার বলল, 'তারা কি এখানে সংকল্পবদ্ধ ও সংগঠিত হয়েছে? অস্ত্রের ট্রেনিং নিচ্ছে?'

ইহুদী বণিক উত্তরে বলল, 'এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে মুসলমানদের তৎপরতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তারা যথারীতি অস্ত্রের ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এ এলাকাকে সুলতান আইয়ুবী তার কমান্ডো দলের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে। এখানকার খতিব তার জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদের উত্তেজিত করে তুলছে। লোকটাকে আমার কেবল ইমাম বলে মনে হয় না, মনে হয় এ লোক কোন সামরিক অফিসার। তার প্রতিটি কথা ও পদক্ষেপ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। কখন কি করতে হবে বা বলতে হবে এ কথা তিনি ভাল করেই জানেন। তিনি দক্ষ সেনা কমান্ডারের মতই প্রতিটি চাল চালছেন।'

'যদি তাকে কৌশলে হত্যা করি তবে কি উপকার হবে মনে করেন?' বুড়ো খৃস্টান বললো।

'না, তাতে কোনই উপকার হবে না।' ইহুদী বণিক বললো, 'বরং তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। মুসলমানরা এ জন্য আমাদের সন্দেহ করবে এবং আমাদের সকলকে ধরে ধরে হত্যা করবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এ এলাকায় এখনো তাদেরই শাসন জারী আছে।'

'এখানে যেসব খৃস্টান ও ইহুদী রয়েছে তাদের মেয়েরা কি কিছুই করতে পারছে না?' বৃদ্ধ খৃস্টান জিজ্ঞেস করলো।

'আপনি তো ভাল করেই জানেন এমন কাজ করতে কি পরিমাণ ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।' ইহুদী বনিক বললো, 'আমাদের মেয়েদের মধ্যে কেউ তেমন প্রশিক্ষণ পায়নি।'

'আপনি কি এখানে মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধের ট্রেনিং বন্ধ করে দিতে চান?' বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো।

'আপনি কেন্দ্র থেকে কি নির্দেশ নিয়ে এসেছেন?' ইহুদী পাল্টা প্রশ্ন করলো।

'আমাকে বলা হয়েছে এখানে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধানোর আয়োজন করতে। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে। জাভীরার জন্য এ কাজ তেমন কঠিন ছিল না। কিন্তু তাকে ছাড়া তো এ কাজ করা সম্ভব নয়। এ কাজ করতে হলে এখানে তার মত আরো দুটি মেয়ে আনানো প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুবই কম।' ইহুদী বললো,

'আপনি তো জানেন, রমলার যুদ্ধে যে আইয়বীকে আমরা পরাজিত করেছিলাম, তিনি বসে থাকার লোক নন। আপনি বাস্তবতা স্বীকার করলে বলবো, এই পরাজয় সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উদ্যম আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঘকে খোঁচা দিলে সে বাঘ যেমন ভীত না হয়ে আরো মারমুখী হয় তেমনি হয়েছে আইয়ুবীর অবস্থা। তিনি নিশ্চয়ই এতদিনে পরাজয়ের ধকল সামলে নিয়ে তার অদক্ষ সৈন্যদেরকে দক্ষ সৈনিকে পরিণত করে নিয়েছেন। কায়রো থেকে গোয়েন্দারা যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তা মোটেই ভাল নয়। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যে কোন মুহূর্তে কায়রো থেকে যুদ্ধ অভিযানে বের হয়ে যেতে পারেন। এখনও জানা যায়নি তিনি কোন দিকে অভিযান চালাবেন বা কোথায় আক্রমণ করবেন। কিন্তু তিনি যে শিঘ্রই অভিযানে বেরোবেন তা নিশ্চিত।

এদিকে তার ভাই তকিউদ্দিনের কাছেও দামেশক থেকে সৈন্য ও রসদ পৌঁছে গেছে। তিনি সম্রাট বিলডনকে এমনভাবে পরাজিত করেছেন, দীর্ঘ দিন সম্রাট বিলডন তার বাহিনীকে ময়দানে পাঠাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ফলে অবস্থা আমাদের জন্য খুবই জটিল ও ঝুঁকিবহুল হয়ে উঠেছে।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অতর্কিত ও কমাণ্ডো আক্রমণে অসম্ভব পারদর্শী। এবারও তিনি এ ধরনের আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনাই করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের আক্রমণ চালালে আমাদের রসদপত্র তাদের কমান্ডো বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা খুবই কঠিন হবে। যদি হেমসের মুসলমানদের মধ্য

থেকেই তারা কমান্ডো নির্বাচন করে থাকে তবে এ বিপদের মাত্রা আরো একশো গুণ বেড়ে যাবে। তখন তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের রসদপত্র অন্যত্র পাঠানো যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি বাইরে থেকে সাহায্য আসার পথও বিপদ মুক্ত নয়।'

'এ জন্যই বলছিলাম, এই অবস্থায় মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে দ্রুত চক্রান্তের জালে বন্দী করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করলে তা আমাদের জন্য কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনবে। আর গুপ্তহত্যার যে চিন্তা আপনি করেছেন তা বাদ দিতে হবে। কারণ ওই পথে গেলে ব্যর্থতা গ্রাস করবে আমাদেরকে। তখন প্রমাণিত হবে আমরা এর সাথে জড়িত আছি। আর এমনটি ঘটলে এখানে যে দু'চার ঘর ইহুদী ও খৃস্টান আছে তাদেরকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এখানকার মুসলমানরা।'

'কিন্তু মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার মত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়ে এখানে নেই। নতুন করে মেয়ে আনতে গেলেও অনেক সময় লাগবে। তারচে আমার যে সঙ্গীরা আছে তারা দু'চারটি অপারেশন করলে তারা একটা ঝাঁকি খাবে। অস্ত্রশস্ত্রের ট্রেনিং সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারে। কিছু না করে বসে থাকার চেয়ে একটা কিছু তো করা দরকার। তাদের জানান দেয়া দরকার যে, হেমসেও তোমাদের দুশমন আছে।'

'কিন্তু তা করতে গেলে ওরা আমাদের মেরে একবারে সাফ করে দেবে!' ইহুদী তার হাতকে তলোয়ারের মত করে ডানে

বামে ঘুরিয়ে বললো, ‘এই মুসলিম এলাকা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে আমাদের। এই অবস্থায় আমাদের স্ত্রী-সন্তান-পরিজন ও ধন-সম্পদসহ এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।’

‘আমি আশা করি খৃস্টান সম্রাটরা তোমাদের অন্যত্র বসতি স্থাপনে সাহায্য করবেন। অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারলে তারা ক্ষতিপুরণ দিতেও প্রস্তুত থাকবেন।’

‘ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বুঝেন তাই করেন। আপনাকে কেন্দ্র থেকে পাঠানো হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আমি ইহুদী, জেরুজালেমে আমাদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য আমি নিজের বাড়ীঘর ধন-সম্পদ ত্যাগ করতেও রাজী আছি।’

‘যদি এটাই হয় তোমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তবে বিষয়টি আমি নতুনভাবে খতিয়ে দেখতে চাই। সে ক্ষেত্রে গুপ্তহত্যার পথে না গিয়ে পুরো জনপদ ধ্বংস করে দেয়ার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?’ বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো।

‘এ জন্য তো সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে!’ অবাক হয়ে বলল ইহুদী।

‘সে ব্যবস্থাও আছে। সেনাবাহিনী রেডী হয়েই আছে।’ বৃদ্ধ বলল, ‘সম্রাট বিলডনের সৈন্য বাহিনী এখান থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে ক্যাম্প করে আছে। আপনি হয়তো জানেন না, এই বাহিনী এখানে আসার পথে যত মুসলিম পল্লী পেয়েছে সব আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, অকাতরে লুণ্ঠন

চালিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ আছে সেখানে একটু ঘি ঢাললে তাদের দিয়েই হেমস ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব। আপনি ভাববেন না, আমি আজই সেখানে যাবো এবং সম্রাট বিলডনকে বলবো হেমস দখল করার এটাই উপযুক্ত সময়।'

'কিন্তু নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ চালালে এখানকার ইহুদী ও খৃস্টানদের কি হবে? আমরা কি এলাকা থেকে সরে পড়বো?'

'আরে না, আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এলাকাটা ধ্বংস হোক।' বৃদ্ধ বললো, 'বরং আমাদের টার্গেট থাকবে যাতে এখানকার কোন মুসলমান জীবিত না থাকে। সৈন্যরা যে পরিমাণ সম্পদ পারে নিয়ে যাবে, বাকীটা তোমাদের। তোমরা নিজেরা তখন মুসলমানদের বাড়ীঘরগুলো দখল করে নেবে। আমি সেভাবেই অভিযান চালানোর জন্য বলে দেবো সম্রাট বিলডনকে।'

'আর সুন্দরী মেয়েদেরকে?' বুড়োর এক সঙ্গী পেছন থেকে প্রশ্নটা তুলল।

'সৈন্যেরা ওদের মধ্য থেকে যাদের পছন্দ করবে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, অবশিষ্টদের পাবে তোমরা।'

সবাই এ প্রস্তাবে একমত হলো। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আজ রাতেই বৃদ্ধ অতিথি সম্রাট বিলডনের ক্যাম্পে যাবেন।

তারা যখন এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠক শেষ করে বাইরে এলো, তখন এক অশ্বারোহীকে দেখলো ছুটে আসছে গ্রামের দিকে। অশ্বারোহী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলো। স্থানীয় ইহুদী আগন্তুককে চিনতে পারল না। বুঝা গেল এ লোক বাইরে থেকে কোন খবর নিয়ে এসেছে। ইহুদী তাকিয়ে রইলো

আগন্তুকের দিকে।
সামনেই খতিবের বাড়ী দেখা যাচ্ছিল। অশ্বারোহী খতিবের বাড়ীর সামনে গিয়ে থেমে গেলো এবং অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে এলো। ইহুদী লোকটি দেখতে পেলো যুবক খতিবের দরোজায় করাঘাত করছে।
খতিব বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং আন্তরিকতার সাথে আগন্তুকের সঙ্গে মুছাফেহা করলেন। তারপর দু'জনই ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন।
'এই অশ্বারোহী দামেশক বা কায়রোর কাসেদ।' ইহুদী বণিক বললো, 'নিশ্চয়ই কোন গুরুতর খবর নিয়ে এসেছে।'

এশার নামাজের পর সমস্ত মুসল্লীরাই চলে গেল। মাত্র পাঁচ ছয় জন লোক খতিবের পাশে বসে রইলো। তাদের মধ্যে আগন্তুক অশ্বারোহীও ছিল। খতিব কোন একজনকে বললো, 'দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও।'
'আমার বন্ধুগণ!' খতিব বললেন, 'আমার এ বন্ধু সুলতান তকিউদ্দিনের কাছ থেকে এই সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খুব শিঘ্রই কায়রো থেকে যুদ্ধ যাত্রায় বের হবেন। আপনরা সকলেই কমাণ্ডো বাহিনীর একেকজন উস্তাদ। আপনাদের এখন কি করতে হবে সে কথা বলে দেয়া আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আপনাদের কাজ আপনারা ঠিক করে নিন। তবে তার আগে নিজ নিজ বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও ট্রেনিং ঠিক মত হয়েছে কিনা তা আবারো যাচাই করে নিন। তকিউদ্দিন সংবাদ পাঠিয়েছেন, খৃস্টান সম্রাট

বিলডন তার সৈন্যসহ হিম্মত এলাকা থেকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আমাদের আশপাশে কোথাও ক্যাম্প করে আছে। যে কোন সময় সে আমাদের ওপর আঘাত হানতে পারে। তাই এদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আজ রাতেই হেমসের বাইরে চারদিকে গোয়েন্দা পাঠিয়ে তারা কোথায় আস্তানা গেড়েছে খবর নিতে হবে। তারা কোথায় এবং কত দূরে আছে জানতে হবে আমাদের। তাদের চলাফেরা ও মতিগতির উপরে দৃষ্টি রেখে তাদের তৎপরতা সম্পর্কে তকিউদ্দিনের কাছে রিপোর্ট পৌঁছাতে হবে। তিনি আরও আদেশ দিয়েছেন, পরিস্থিতি বুঝে বিলডনের খৃস্টান বাহিনীর উপর অতর্কিত কমান্ডো আক্রমণ চালাতে দ্বিধা করবে না। তাদের উপর ততক্ষণ কমান্ডো আক্রমণ অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ তারা পরাজয় স্বীকার না করে বা তোমাদের সাহায্যে আমরা এসে না পৌঁছাই। যাতে তারা শান্তিতে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এখন আমাদের।

সেই সাথে তকিউদ্দিন আরও বলেছেন, তাদের সৈন্যরা অনেক মুসলমান গ্রাম ও বস্তি ধ্বংস করে হেমসের কাছে পৌঁছেছে। তাদের মনোভাব ভাল থাকার কথা নয়। সুযোগ পেলে তারা হেমসেও আক্রমণ করে বসতে পারে। অতএব তাদের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকবে।

তকিউদ্দিন আরো জানিয়েছেন, তার কাছে সৈন্য সংখ্যা কম বলে তিনি খৃস্টান সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করেননি। তিনি বলেছেন, যদি বিলডনের বাহিনী আরও পিছনে সরে যেতে চায় তবে তাদের বিরক্ত করবে না। তাদেরকে নির্বিঘ্নে সরে

যেতে দেবে। অযথা আক্রমণ করে হেমসের জনপদে হামলে পড়ার সুযোগ তাদের দেয়ার দরকার নেই।

তিনি আমাদের প্রশিক্ষণ ও ট্রেনিং জোরদার করার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, এমনও হতে পারে, সুলতান আইয়ুবী অভিযান শুরু করলে বিলডন গোপনে পিছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করতে পারে। তাই অবস্থার প্রেক্ষিতেই আমাদেরকে বিলডনের বাহিনীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে অতর্কিতে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে তাদের গতিরোধ করে সেখানেই আটকে রাখতে হবে যেন কোন দিকে তারা অগ্রসর হতে না পারে।'

খতিব বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন বিলডন বাহিনীর তালাশে আর অবশিষ্টদের বললেন, 'পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় তোমাদেরকে মহল্লার চারদিকে পাহারা বসাতে হবে।'

তানভীর ও জাভীরা হেমসের লোকালয়ে প্রবেশ করলো। জাভীরার তখন হাঁটার মত কোন অবস্থা ছিল না। তানভীর তাকে আহত মানুষের মত কাঁধের উপর তুলে নিয়ে এগুচ্ছিল। রাস্তায় ওরা পান করার মত পানি পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাদের ভাগ্যে কোন খাবার জুটেনি। ফলে ক্ষুধায় মেয়েটি একেবারেই কাতর হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া মেয়েটি বড় হয়েছে অসম্ভব আদর যত্নে। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয়ার কোন অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তাই কিছু দূর যাওয়ার

পরই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আস্তে ধীরে চলতে গিয়ে পথেই তাদের রাত হয়ে যায়। মেয়েটি যখন কিছুতেই আর হাঁটতে পারছিল না তখন তানভীর তাকে কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয়। তানভীর রাত নামার আগেই হেমসে পৌঁছতে চাচ্ছিল। তাই মেয়েটি যখন এক টিলায় চড়তে গিয়ে অপারগতা প্রকাশ করে বসে পড়ল তখন তানভীর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগুতে লাগল। তারপরও পথেই তাদের রাত হয়ে গেল।

কিন্তু তখন হেমস আর বেশী দূরে ছিল না। তানভীর কোথাও না থেমে সন্ধ্যার একটু পরে হেমসের জনবসতিতে প্রবেশ করলো।

নিজের বাড়ীর সামনে এসে সে মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল। সকালেই বাড়ীর সকলে খবর পেয়েছিল, তানভীর মারা গেছে। তারা তার ঘোড়াও পেয়েছিল। ফলে সবাই বিশ্বাসও করেছিল সে আসলেই মারা গেছে। এখন মেয়েটিসহ তাকে পেয়ে সবাই বিস্মিতও হলো আবার স্বস্তিও পেল। শোকের বদলে সবার চেহারায় আবার ঝলসে উঠল আনন্দের ঝিলিক। তানভীর সবাইকে তার দুর্যোগপূর্ণ সফরের কাহিনী খুলে বলতে লাগল।

জাভীরা জানতো, তার ঠিকানা হবে এক ইহুদী বণিকের বাড়ী। সে ওখানে পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে সে ইহুদীর নাম বলে তাকে সেই বাড়ীতে পৌঁছে দিতে বলল।

বাড়ীর লোকজন তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করল। তানভীর বলল, 'হাত-মুখ ধুয়ে চারটে মুখে দিয়ে নাও, আমি এখুনি তোমাকে সেই বাড়ীতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি।'

মেয়েটি খেতে বসে আবার বলল, 'আমার মন বলছে, সম্ভবতঃ বাবা মারা যাননি। তিনি বেঁচে থাকলে এতক্ষণে ওখানে পৌঁছে গেছেন। আমাকে ওই বাড়ীতে পৌঁছে দাও।'

তাদের খাওয়া শেষ হলো। তানভীর তাকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীর বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

ইহুদীর বাড়ীটি তাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে ছিল না। নাম শুনেই তারা চিনতে পেরেছিল বাড়ীটি।

পথটি ছিল বেশ অন্ধকার। জাভীরা কিছু দূর এগিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। তানভীর বললো, 'কি হলো, থামলে কেন?'

মেয়েটি এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তানভীর, আর কখনো আমাদের দেখা হবে না!'

সে কখনো তার মুখ তানভীরের বুকের মধ্যে ঘষতে লাগলো। আবার কখনও সরে গিয়ে তার হাতে চুমু দিতে লাগলো, আর বলতে লাগলো, 'বলো তানভীর, এই কি আমাদের শেষ দেখা!'

তানভীর মেয়েটির এ ধরনের আচরণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। শেষে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললো, 'দেখো মেয়ে, আমাদের দু'জনের পথ ও ঠিকানা সম্পূর্ণ পৃথক। তোমাকে তোমার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়াই আমার এখন একমাত্র কাজ। তারপর ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা নিয়ে আমি ভাবি না। ছাড়ো আমাকে। আমি এসব পছন্দ করি না।'

জাভীরা তাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে আবেগে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'কিন্তু এমন কি হতে পারে না, দুটি পথ চলতে চলতে আবার এক মোহনায় মিলিত হয়ে গেলো। সেই

মোড়ে আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ করবো। আবার আমি তোমাকে এমনি করে জড়িয়ে ধরবো?'

তানভীর জোর করে মেয়েটির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'বললাম তো, ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

'আমি জানি। যখন তুমি তোমার প্রভুর কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করছিলে, তখন আমার নব জন্ম হয়েছে। তখনই আমি আমার আত্মার সন্ধান পেয়েছি। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, তোমাকে ভুলতে পারবো না কোনদিন।

ভালবাসা কি জিনিস আমার জানা ছিল না। তুমি শুধু এটুকু কথা দাও, আমাকে তুমি ভুলে যাবে না।'

'না! জাভীরা, না! কথা দিচ্ছি, কখনও আমি তোমাকে ভুলে যাবো না।' আবেগে তখন কাঁপছিল তানভীরের কণ্ঠও, 'আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। তবে বলতে বাঁধা নেই, এখনো তোমার আর আমার পথ ভিন্ন। যদি কখনো এমন হয়, ইসলামের সুশীতল ছায়ায় বাস করতে রাজি হয়ে যাও তুমি, তবে তোমার কাঙ্খিত সেই মিলন মোহনায় আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। আমার মনে এতদিন কোন মেয়ে প্রবেশ করেনি। তুমিই সে মেয়ে যে আমার মনে ভালবাসার বীজ ছড়িয়েছো। বিশ্বাস করো, আর কোন মেয়ে এ মনে প্রবেশ করতে পারবে না।'

'তাহলে কথা দাও, আমি তো এখন থেকে তোমার কাছাকাছিই থাকবো, মাঝেমধ্যে আমার সাথে দেখা করবে? আমার থেকে দূরে সরে যাবে না!'

'কথা দিলাম, আমরা পরস্পর সাক্ষাত করবো। আর এমন জায়গায় আমাদের দেখা হবে, যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না।'

তানভীর তার আমানতের কোনই খেয়ানত করেনি। এই দীর্ঘ যাত্রা পথে মেয়েটি সত্যি তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর পরবর্তীতে মেয়েটিও তানভীরের প্রাণে গেঁথে গিয়েছিল। এখন সে তার বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে মেয়েটিকে ইহুদীর হাতে তুলে দিয়ে আসতে যাচ্ছে।

ওরা ইহুদীর বাড়ী পৌঁছে গেল। তানভীর দেখতে পেল, ইহুদীর বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ খৃস্টানও আছে যাকে জাভীরা তার বাবা বলে পরিচয় দিয়েছিল।

জাভীরাকে পেয়েই বৃদ্ধ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

ইহুদী বণিক তখন বাড়ী ছিল না। সে তখন সম্রাট বিলডনের সেনা ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। যদিও সেখানে যাওয়ার কথা ছিল বৃদ্ধের কিন্তু ইহুদী বললো, 'আপনি এখানে আগন্তুক। স্বাভাবিকভাবেই আপনার পেছনে গোয়েন্দা লেগে যেতে পারে। কিন্তু আমরা স্থানীয় বলে আমাদের চলাচলে কেউ তেমন নজর দেবে না। তাই বলছিলাম কি, সম্রাট বিলডনের ক্যাম্পে আপনি না গিয়ে আমি গেলে কেমন হয়?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। রাস্তায় বহিরাগতদের কম বেরোনোই ভাল। তাহলে বিলডনের ক্যাম্পে আপনিই যান, আমি আপনার ফিরে আসার অপেক্ষা করবো।'

ইহুদী বিলডনের ক্যাম্পের উদ্দেশ্য রওনা দেয়ার খানিক পরই তানভীর জাভীরাকে নিয়ে ওই বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে।

তানভীর জাভীরাকে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল। বৃদ্ধ খৃস্টান তাকে বসার অনেক অনুরোধ করলেও সে ওখানে দাঁড়ালো না, বলল, 'এখন নয়, আবার আসবো।'
ওখান থেকে বেরিয়েই সে সোজা মসজিদে চলে গেল। ইমাম সাহেবের কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সে দরজায় করাঘাত করলো। ইমাম সাহেব দরজা খুলে তাকে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি!'
সে এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এক বছরের মধ্যেই তাঁর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে নিলেন। তিনি অভিযান পরিচালনার জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করা ঠিক মনে করলেন না। যে রাতে হেমসের ইহুদী বণিক সম্রাট বিলডনের কাছে যাচ্ছিল হেমসের মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার আবেদন নিয়ে, সে রাতেই সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনী কায়রো থেকে বের হয়ে পড়ে।
তাদের প্রথম ঠিকানা ছিল দামেশক। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পথ চলার হুকুম দিয়েছিলেন সুলতান, তাই বাহিনী ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল।
যুদ্ধের এ নতুন অভিযানে কোথাও সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না সুলতান। তাঁর পরিকল্পনা ছিল দামেশক পৌঁছে তিনি সুলতান তকিউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করবেন। তারপর কায়রো ও দামেশকের মিলিত সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন

অভিযানে। তার সহযোগিতায় থাকবে তকিউদ্দিনের বাহিনী। কিন্তু দেখা গেল, দামেশক পৌঁছার আগেই তিনি তার গতিপথ পরিবর্তন করে ফেললেন। এই গতিপথ পরিবর্তনের কারণ ছিল এক দূত।

দূত জানতো না সুলতান আইয়ুবী অভিযানে বেরিয়েছেন। সে সুলতান আইয়ুবীর নামে এক চিঠি নিয়ে কায়রো যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখতে পেলো একদল সৈন্য এবং সেই বাহিনীর সামনে সুলতানের পতাকা। সুলতানের পতাকা দেখে সে ছুটে সেই বাহিনীর মুখে গিয়ে পড়লো।

দূতকে সাথে সাথে সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির করা হলো। দূত সুলতান আইয়ুবীর হাতে ইয়াজুদ্দিনের পত্র তুলে দিল।

ইয়াজুদ্দিন সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর একজন উপদেষ্টা ও সহযোগী ছিলেন। তিনি সে সময় এক পরগণার শাসক পদে উন্নীত ছিলেন। ইয়াজুদ্দিন ছিলেন একজন মর্দে মুমীন। সে কারণে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গী মৃত্যুর আগে তাকে হলবের একটি পরগণা ও কেল্লার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই কেল্লার অধীনে বিশেষ বিশেষ কিছু অঞ্চল ছিল। তেমনি একটি অঞ্চল ছিল মালহাক। এলাকাটি খৃস্টান সীমান্তের নিকটবর্তী। খৃস্টানরা মাঝে মধ্যেই এ এলাকায় ঢুকে পড়ে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতো। আক্রমণ করে লুটপাট ও নির্যাতন চালাতো। ইয়াজুদ্দিনের ক্ষমতা ও শক্তি এমন ছিল না যে, একা তাদের মোকাবেলা করে। আবার তিনি হলব এবং মুশেলের কোন সাহায্যও নিতে পারছিলেন না। কারণ যখন থেকে হলব ও

মুশেলের সরকার আল মালেকুল সালেহ ও সাইফুদ্দিনেরা সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জোট গঠন করে, তখন থেকেই ইয়াজুদ্দিন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

তিনি সুলতান আইয়ুবীকে যে চিঠি পাঠান তা এরূপ:

'মহা সম্মানিত সুলতান আইয়ুবী বিন নাজমুদ্দিন আইয়ুব! সম্মানিত সুলতানে মিশর ও সিরিয়া! আপনার উপরে ও ইসলামী রাজ্যের উপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার আনুগত্য সম্পর্কে আপনার কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই। আমি আল খালিদের দিক থেকে ক্রুসেডদের আক্রমণের পথ প্রতিরোধ করে রেখেছি। এদিকের সমস্ত এলাকার যুদ্ধ অভিযানের পথগুলো আমার কমান্ডো বাহিনীর দৃষ্টির গোচরে রয়েছে। তারা সব সময় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। খৃস্টানরা আমাকে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য ইবনে লাউনের সাথে গোপন চুক্তি করে জোট বেঁধেছে। আপনি ভাল করেই জানেন, আমার সীমান্ত সেই এলাকার সাথে মিশেছে, যে এলাকা প্রকৃতপক্ষে আর্মেনীয়দের এলাকা। সেই আর্মেনীয়রা আমার সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আপনি ভাল মতই জানেন যে, আমার সৈন্য সংখ্যা নেহায়েতই সামান্য। খৃস্টান ও আর্মেনীয়রা আমার কাছে দু'বার মোটা উপহার দিয়ে দূত পাঠিয়েছিল। তারা আমাকে আহবান জানাচ্ছে তাদের জোটে মিলিত হতে। তারা আমাকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আমার অস্বীকৃতি তাদেরকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। তারা আমাকে আক্রমণের হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সীমান্তে

হামলা করে আমাকে ভড়কে দেয়ার চেষ্টা করছে।
যদি আমার অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকতো তবে রাজ্য রক্ষার জন্য আমি তাদের আহবানে সাড়া দিতে দ্বিধা করতাম না। কিন্তু শাহাদাত ছাড়া আমার সামনে এখন আর কোন পথ খোলা নেই। আমি সে পথকেই আমার জন্য বেছে নিয়েছি। আমার জন্য আপনার কাছে কোন আবদার বা দাবী নেই। আমি পেরেশান এ অঞ্চলের সাধারণ মুসলমানদের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমি তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিয়েছি। আমার ক্ষুদ্র বাহিনী তাদের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা সেভাবেই করছে, যেমনটি করা উচিত প্রকৃত মর্দে মুজাহিদদের। আমি সব বিপদকে মাথা পেতে নিয়েছি একমাত্র আল্লাহর ভরসায়। আমি আমার জীবন, এই কেল্লা এবং আমার এলাকা আল্লাহর পথে কুরবান করে দেবো, তবুও ক্রুসেডদের সঙ্গে জোট বাঁধবো না।
সম্মানিত সুলতান! আমি মরহুম নুরুদ্দিন জঙ্গীর আত্মার সামনে জবাবদিহী করবো আর আমি তার লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মার কাছেও জবাবদিহী করে বলবো, মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা মুক্ত করার যে সংগ্রাম আপনি করছেন তাতে বিঘ্ন ঘটাতে চাইনি বলেই আমি আপনাকে বিরক্ত করিনি। আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে সেই পথ ধুয়ে মুছে সাফ করার চেষ্টা করেছি। আমি তাদের বলবো, আপনি আপনার সংকল্প থেকে বিন্দুমাত্র টলেননি, বরং সে জন্য আপনার অবিরাম চেষ্টা জারী রেখেছেন।
আমি জানি, রমলার ঘটনার পরে আপনি নতুন করে সেনা

সংগঠন ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে খুবই ব্যস্ত আছেন। আমার এটাও জানা আছে, সম্মানিত সুলতান তকিউদ্দিনও বাস্তব কারণেই আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে পারছেন না। আমি আমার অবস্থা জানিয়ে আপনাকে সতর্ক করা প্রয়োজন বোধ করছি।

সম্মানিত সুলতান! আপনাকে নেতা মানি বলেই প্রকৃত অবস্থা আপনাকে জানানো আমি জরুরী মনে করেছি। আমার পরিকল্পনা আপনি শুনেছেন, যদি আমার ব্যাপারে আপনার কোন আদেশ থাকে বাহককে জানাবেন। আমার ব্যাপারে আপনি যে ফয়সালা নেবেন সেটাই আমার ফয়সালা। ক্রুসেড বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করা ছাড়া আপনি যে হুকুমই আমাকে দান করবেন আমি তা নির্দ্ধিধায় মেনে নেবো।

আপনি যদি বলেন আমার সব সৈন্য নিয়ে আপনার কাছে চলে আসতে, তাতেও আমি রাজি। আমার শুধু একটাই শর্ত, আমি কোন মূল্যেই ক্রুসেড ও আর্মেনিয়ানদের সাথে কোন আপোস করবো না।'

সুলতান আইয়ুবী চিঠিটি পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাফেলার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়ে সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের জরুরী বৈঠক ডাকলেন। সবাই সমবেত হলে তিনি চিঠিটি এক সেনাপতির হাতে দিয়ে বললেন, 'সবাইকে পড়ে শোনাও।'

চিঠি পড়া হয়ে গেলে তিনি সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বলো তোমাদের পরামর্শ কি? এখন আমাদের কি করা উচিত?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, 'ইয়াজুদ্দিনের শাহাদাতের তামান্নার

সাথে আপনি আমাদেরকেও শরীক হতে দিন। আল্লাহ শাহাদাত পিয়াসী বান্দাদের বার বার বিজয় দিয়েছেন। হয় আমরা সে ময়দানে শহীদ হয়ে যাবো নয়তো বিজয় এনে তুলে দেবো আপনার মোবারক হাতে।'

সুলতান আইয়ুবী আর বিলম্ব করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদেশ জারী করলেন, 'অভিযানের দিক পরিবর্তন করো। আমাদের গতি হবে ইবনে লাউনের দিকে। ইয়াজুদ্দিনের ওপর আক্রমণকারীদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার, মুসলমানদের দেহ একটাই। এর যে কোন অংশে আঘাত লাগলে তার প্রতিবিধানের জন্য মুসলমানরাই যথেষ্ট। আল্লাহ তার বান্দাদের অপমানিত হওয়ার জন্য দুনিয়ায় প্রেরণ করেননি।'

সুলতান আইয়ুবী একনায়কের মত কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন তার পরিষদের সবার সাথে পরামর্শ করেই। তবে তিনি কি চান সেটাও সঙ্গীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখতেন না। তাঁর ভাবাবেগ ও চেহারাই বলে দিত তিনি কি চান। আর তাঁর সঙ্গীরাও তাঁরই মত মন-মস্তিষ্ক ও আবেগ নিয়ে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে পারতেন। যে কারণে দেখা যেতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবাই সম্মিলিতভাবে একই রকম সিদ্ধান্তের প্রতি ঝুঁকে যেতেন। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই কাফেলা তার দিক পরিবর্তন করে ইবনে লাউনের দিকে যাত্রা করলো।

দূতের জন্য এটা ছিল এক অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। দূত ইবনে লাউনের প্রকৃত অবস্থা জানতো, সেই সাথে এটাও জানতো, এই চিঠিতে কি লেখা আছে। তার প্রথম বিস্ময়ের

কারণ ছিল, কায়রো পৌঁছার অনেক আগেই সুলতানকে পেয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় কারণ ছিল, তাঁর বাহিনীকে সম্পূর্ণ রণসাজে পাওয়া। তৃতীয় বিস্ময় হয়ে দেখা দিল, মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এ সশস্ত্র বাহিনীর দিক পরিবর্তনের ঘটনাটি। সামান্য এক পরগণার ক্ষুদ্র এক শাসকের ছোট্ট একটি চিঠির শক্তি দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। সে বিস্ময়ের ধাক্কা সামাল দিতে না পেরে মুখ ফসকে বলেই ফেললো, 'মহামান্য সুলতান! সত্যি আপনি ইবনে লাউন যাবেন?'

'কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে? আমার উস্তাদ মরহুম নুরুদ্দিন জঙ্গীর এক শিষ্য ডাক দিয়েছে তার ভাইকে। ভাই কি সে ডাক ফেলতে পারে?'

'তবু! এ অভিযানের ভালমন্দ খতিয়ে দেখা কি প্রয়োজন ছিল না? আমার তো মনে হলো, বাস্তবতা যাচাই না করেই আপনি আবেগের বশে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

পথ চলতে চলতেই কথা বলছিল কাসেদ। সুলতান তাকে ডেকে সঙ্গে নিয়েছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইবনে লাউনের সর্বশেষ অবস্থা বিস্তারিত জানার জন্য। কাসেদের কথা শুনে তিনি বললেন, 'ভুল বললে মুজাহিদ। অবশ্যই আমি আবেগের মূল্য দেই। কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে অস্বীকার করি এমন অভিযোগ তুমি করতে পারো না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, ইয়াজুদ্দিনের উক্তিতে আমি আমার উস্তাদ নুরুদ্দিন জঙ্গীর ধ্বনিই যেনো শুনতে পেয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক এবং আমাদের সংকল্পও এক। যে আবেগ তাকে ক্ষমতা ও রাজ্যের লোভ থেকেই রক্ষা করেনি বরং সেই

আবেগের জন্য নিজের জীবনটাও কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়েছে সেই একই আবেগ লালন করি আমিও। তার স্বপ্নের সাথে আমার স্বপ্ন ও সিদ্ধান্ত মিলে গেছে বলেই আমি দিক পরিবর্তন করে ইবনে লাউনের পথ ধরেছি এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং সব দিক বিবেচনা করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।'

'সম্মানিত সুলতান!' কাসেদ বলল, 'বেয়াদবী না নিলে জানতে চাই, কোন বাস্তবতা আপনাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে সহায়তা করেছে?'

'দুনিয়ার বর্তমান বাস্তবতাই আমাদেরকে এ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে।' বললেন সুলতান, 'বাস্তবতা এখন এই যে, এখন আমরা দামেশকে গেলে খৃস্টানের সহযোগিতায় ইবনে লাউনের সৈন্য ইয়াজুদ্দিনের উপর আক্রমণ করে বসবে। আর তাদের আক্রমণ একা প্রতিরোধ করতে পারবে না ইয়াজুদ্দিন। ইবনে লাউনের সামনেই হলব রাজ্য। তোমরা সবাই আল মালেকুস সালেহকে জানো। তার উপদেষ্টাদেরকেও তোমরা ভাল করেই চেনো। সে বাধ্য হয়ে আমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেও চুক্তি তো কোন লৌহ কপাট নয় যে তা ভাঙা যাবে না। যুদ্ধ শুরু হলে তাদের মাথা আবার বিগড়ে যেতে পারে। কোন লোভের টোপ দেখলেই তারা আমাদের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করে ক্রুসেড বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে যাবে, এ সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু আমি ক্রুসেড বাহিনীকে হলবের সীমানায় আমন্ত্রণ জানাতে পারি না। এ জন্যই আমি ইয়াজুদ্দিনকে নিঃসঙ্গ রাখতে চাই না। কারণ সে হচ্ছে

আমাদের সীমান্ত প্রহরী। এখানে কোন ফুটো তৈরী হলে সে ফুটো দিয়ে জোয়ারের পানি ঢুকবে। সেই পানির সাথে থাকবে কুমীর। ক্রুসেড কুমীরদের প্রতিরোধ করাই এখন বাস্তবতার দাবী। অতএব আমরা যা করছি, জেনে বুঝে ভেবেচিন্তেই করছি।'

সুলতান আইয়ুবী ইয়াজুদ্দিনের দূতকে বললেন, 'তুমি ইয়াজুদ্দিনকে আমাদের আগমনের খবর দিয়ে বলবে, তিনি যেন আমরা আসার আগ পর্যন্ত দুশমনকে তার এলাকায় প্রবেশের কোন অধিকার না দেয়। প্রয়োজনে তাদের সাথে আপোষরফার কথাবার্তা চালাতে থাকে। তাকে শক্তি নয়, কৌশলে শত্রুর মোকাবেলা করতে বলবে। প্রয়োজনে তাকে এমন ভান করতে বলবে, যেন দুশমন তাকেও তাদেরই একজন ভাবতে পারে।' তিনি বললেন, 'তুমি যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যাও। আমরা আসছি।'

ইয়াজুদ্দিনের দূত দ্রুত এ সংবাদ নিয়ে ছুটে চললো মালহাক অভিমুখে।

খৃস্টান গোয়েন্দারা সারা দেশ জুড়েই ছড়িয়েছিল। তারা সুলতান আইয়ুবীর গতিবিধি লক্ষ্য করে ক্রুসেড বাহিনীর কাছে নিয়মিতই রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল। সুলতান আইয়ুবী বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ার সাথে সাথেই তারা এ খবর পৌঁছে দিয়েছিল কেন্দ্রে। তারা জানিয়েছিল, 'সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত দামেশকের দিকে ছুটে চলেছে।'

কিন্তু তারা ভালভাবেই জানতো, সুলতান আইয়ুবীর চাল বুঝে

নেয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়। তিনি আদৌ দামেশক যাবেন কিনা, এই নিয়েও তাদের মধ্যে সন্দেহ কাজ করছিল। তাই তারা সুলতানের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছিল।

সুলতানকে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে দেখে তাই তারা বিস্মিত হলো না। সঙ্গে সঙ্গে তারা সুলতানের গতিপথ পরিবর্তনের খবর কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিল।

ক্রুসেড বাহিনীর সম্মিলিত হেড কোয়ার্টারে যখন গোয়েন্দাদের এই খবর পৌঁছলো যে, সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী দামেশকে যাওয়ার পরিবর্তে অভিযানের গতিপথ ইবনে লাউনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, খৃস্টান জেনারেলরা বললো, 'সুলতান আইয়ুবী তাঁর পরীক্ষিত ময়দান বেছে নিয়েই যুদ্ধে নামতে চাচ্ছে।'

হেমসের সেই ইহুদী বণিক, যে হেমসের মুসলিম জনপদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার আবেদন নিয়ে সম্রাট বিলডনের সেনা ক্যাম্পে গিয়েছিল, সে ফিরে এসেছে। সেখানে সে সম্রাট বিলডনের সাক্ষাৎ পায়নি। কারণ তখন তিনি তার খৃস্টান বন্ধুদের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন।

বিলডনের জেনারেলরা ইহুদী বণিকের প্রস্তাব শুনে তাকে বলে দিয়েছে, 'আপনার প্রস্তাব উত্তম। কিন্তু সম্রাটের আদেশ ছাড়া আমরা কোন অভিযান পরিচালনা করতে পারি না। তিনি ফিরে আসুক। তিনি এলে বিষয়টি অবশ্যই আমরা তার কাছে উত্থাপন করবো।'

ইহুদী ফিরে এসে দেখলো, জাভীরা জীবিত ফিরে এসেছে।

সে অবাক হয়ে বললো, 'তুমি! তবে যে সবাই বললো তুমি ডুবে মারা গেছো!'

'তাই গিয়েছিলাম।' জাভীরা বললো, 'তানভীর নামের এক মুসলমান যুবক আমাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'তানভীর! ওকে তো আমি চিনি। সে ওখানে কি করছিল! সে তো এই হেমসেরই যুবক!'

'হ্যাঁ, সে হেমসেরই যুবক। আমাদের কাফেলার সাথেই সেও ওদিক থেকেই আসছিল। আমি যখন ডুবে যাচ্ছিলাম তখন সে আমাকে উদ্ধার করে। আমরা স্রোতের টানে অনেক ভাটির দিকে চলে গিয়েছিলাম, তাই কাফেলাকে খুঁজে পাইনি। রাত্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার হাঁটার মত কোন শক্তি ছিল না। তাই রাতটা আমরা এক পাহাড়ের গুহায় কাটিয়ে পরদিন যাত্রা করি।'

জাভীরার কথা শুনে চিন্তিত দেখালো ইহুদী বণিককে। সে বললো, 'কিন্তু আমি ভাবছি, তানভীর ওদিকে কেন গিয়েছিল?'

পরদিন। ইহুদী বণিক তানভীরকে তার বাড়ীতে ডেকে পাঠাল। তানভীর এলে তাকে বললো, 'আমি খুবই খুশী হয়েছি যে, তুমি আমার বন্ধু কন্যা জাভীরাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছো। তোমার এ কাজের বদলা দেয়ার কোন সাধ্য আমাদের নেই। শুধু কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে সামান্য উপহার। আশা করি তুমি আমার এ উপহার গ্রহণ করবে।'

তানভীর ইহুদীর দেয়া পুরস্কার নিতে অস্বীকার করে বললো, 'একি বলছেন আপনি! আমি তো আমার মানবিক দায়িত্ব

পালন করেছি শুধু। না, এর বিনিময়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে কিছু নিতে পারবো না।'

'কিন্তু বাবা, তুমি এত বড় উপকার করলে, আর আমরা তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না!'

'কেন, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের নেক দৃষ্টিই আমার জন্য বিরাট পাওনা।'

'তাহলে কথা দাও, মা মরা এই মেয়েটিকে মাঝে মধ্যে দেখতে আসবে?'

'অবশ্যই আসবো। আপনারা আমাদের পড়শী। এক পড়শী আরেক পড়শীর ভাল-মন্দ খবর নেবে না, তাও কি হয়! নিশ্চয়ই আমি আসবো।' তানভীর এই বলে সেখান থেকে বিদায় নিল।

এ ইহুদীর কাছে জাভীরার মত মেয়ের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা সে হেমসের মুসলমানদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। এখন খালি সম্রাট বিলডনের ফিরে আসার অপেক্ষা। তিনি নিশ্চয়ই এ প্রস্তাব খুশী চিত্তে লুফে নিবেন। তাই সে বৃদ্ধ খৃস্টানকে বললো, 'জাভীরাকে এখন আর কি দরকার! আমি তো সম্রাট বিলডনের বাহিনীকে দাওয়াত করেই এসেছি।'

'হ্যাঁ, একটা জটিল কাজ খুব সহজ হয়ে গেল। আমিও সে কথাই ভাবছিলাম।'

'তাহলে জাভীরাকে আবার হেড কোয়ার্টারে ফেরত পাঠিয়ে দিলেই তো হয়!'

জাভীরাকে বলা হলো এ কথা। সে ছিল চতুর মেয়ে। সে

চাচ্ছিল এখানে আরো কিছুদিন থেকে যেতে। বললো, 'কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় না দেখেই চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? আর লড়াইয়ের সময়ও তো আমার দরকার হতে পারে। বিশেষ করে খতিবকে যদি আমি বাগে নিয়ে আসতে পারি তবে হয়তো লড়াইয়ের প্রয়োজনই হবে না।'

'কিন্তু খতিবকে তুমি কিভাবে বাগে আনবে?'

'সেটা আমার ব্যাপার। সেটা যদি তোমরাই পারতে তবে আমাদের মত মেয়েদের এত ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণের আর কি দরকার ছিল?' তাছাড়া ভুলে যাচ্ছো কেন, এখানকার মুসলমানদের উদ্দেশ্য এবং সংকল্প জানতে হলেও আমার প্রয়োজন আছে। আমি তাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করে তাদের ঐক্য ধ্বংস করে দিতে পারবো। মুসলমানদের এ অনৈক্যই তোমাদের বিজয়কে নিশ্চিত করবে।'

জাভীরার যুক্তি ফেলে দেয়ার মত ছিল না। সুতরাং ইহুদী তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিল এবং তাকে হেমসেই রাখার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু বৃদ্ধ খৃস্টান বা ইহুদী কেউ জানতেও পারলো না, জাভীরা শুধু তানভীরের জন্যই আরো কিছুদিন হেমসে থাকতে চাচ্ছিল।

জাভীরাকে তানভীর ইহুদীর বাড়ীতে রেখে আসা পর্যন্তই তার দায়িত্ব বলে জ্ঞান করেছিল। কিন্তু ঘটনা সেখানেই থেমে থাকেনি। পরদিন ইহুদীর বাড়ীতে তার যে আলাপ হয় তাতে ইহুদীর বাড়ীতে তার যাতায়াত অবাধ অধিকার লাভ করেছিল। সেই অধিকার জাভীরা ও তানভীরকে এক নতুন পৃথিবীতে টেনে নিল। তাদের মধ্যে শুরু হলো নিয়মিত

মেলামেশার খেলা। রাতের আঁধারে লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে খোলা মাঠে গিয়ে ওরা বসতো। গল্প করতো ঘন্টার পর ঘন্টা। দু'জনের দুই আলাদা পৃথিবী এক হয়ে মিশে যেতো সেই গল্পের ভূবনে।

খৃস্টান মেয়েটির মধ্যে ছিল রাজমহলের আভিজাত্য। বিলাসের বিচিত্র উপকরণ দিয়ে সেভাবেই তাকে গড়ে তোলা হয়েছে। তাকে শেখানো হয়েছে কিভাবে শাহজাদা বা আমীর ও বাদশাহদের কব্জা করতে হয়। সে তুলনায় তানভীর ছিল নিতান্তই এক গ্রাম্য যুবক। একে কব্জা করা মেয়েটির কাছে ছিল এক তুচ্ছ কাজ। কিন্তু এই তুচ্ছ কাজটিও জাভীরা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে করছিল।

দামেশকে তার প্রশিক্ষণের সময় এ মেয়ে দুই আমীরকে তার পদতলে বসিয়ে রাখতো। তাদের দিয়ে সে এমন ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিল যে, সেই ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য স্বয়ং সুলতান আইয়ুবীকে দামেশকে ছুটে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তানভীরের সাথে তার মেলামেশাটা ছিল আসলেই আন্তরিক। দুর্যোগের বিভীষিকা এবং তানভীরের সে সময়কার কর্মকান্ডে মেয়েটি নিতান্তই অভিভুত হয়ে পড়েছিল। তানভীরের ব্যবহার তার সত্বাকে এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছিল যে, মেয়েটি নিজের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। তার মধ্যে জন্ম নিল আবেগপ্রবনতা। সে অনুভব করলো, তার অন্তরের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে থরো থরো প্রেমের লাল গোলাপ। দিনে দিনে সে গোলাপ সুবাস ছড়াতে শুরু করলো। কখন যে সে তার ভালবাসায় তানভীরকে সিক্ত করে ফেলল এবং নিজেও

তানভীরের ভালবাসায় বিভোর হয়ে গেলো, নিজেও টের পেলো না। কিন্তু তারপরও মেয়েটি ছিল খৃস্টানদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক গোয়েন্দা। তার একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল, ছিল সুস্পষ্ট এ্যাসাইনমেন্ট। সেই এ্যাসাইনমেন্টের কথা তো সে ভুলে যেতে পারে না। তাই সে একদিন কথায় কথায় তানভীরকে জিজ্ঞেস করলো, 'তানভীর, একটি কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'কি কথা, বলো?'

'খতিব এবং আরও যারা তোমাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তারা কি সবাই এখানকার, নাকি বাইরে থেকে এসেছে?'

তানভীর নাম ধরে ধরে তার উত্তর দিতে শুরু করলে জাভীরাই আবার বলে উঠলো, 'থাক এখন সে কথা। এখন সেসব খবর নিয়ে আমাদের কি লাভ, যে যা করার করুক। আমরা এমন সুন্দর রাত কেন যুদ্ধের কথা বলে নষ্ট করবো।'

এমনিভাবে সে দু'দিকই সামাল দিতে লাগলো। অথবা বলা যায়, সে নিজেই দোদুল্যমানতায় ভুগতে লাগল। সে যখন তানভীরের সাথে থাকে তখন এক অবুঝ প্রেমিকা ছাড়া নিজেকে আর কিছুই ভাবতে পারে না। তার তখন এ কথাও মনে থাকে না যে, সে এক গোয়েন্দা। তাকে কায়রো থেকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই জাভীরাই যখন ইহুদী বণিকের ঘরে যায় এবং তার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সে তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের মত সমান তালে মুসলমানদের ধ্বংসের পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠে।

এভাবে দেড়-দু'মাস অতীত হয়ে গেল। এক সন্ধ্যায় জাভীরা তানভীয়ের বাড়ী চলে এলো। সে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। এক সময় সে সুযোগ পেয়ে তানভীরকে ইশারায় কিছু বললো। তানভীর বুঝতে পারলো তার ইশারা। তারপর মেয়েটি তানভীরের আম্মাকে বললো, 'রাত হয়ে যাচ্ছে খালা। আমি এখন যাই।'

মেয়েটি চলে গেলে তানভীরের আম্মা সান্ধ্য ব্যস্ততা ও মাগরিবের নামাজের জন্য ঘরে চলে গেলেন। তানভীরও মসজিদের জন্য পা বাড়াল।

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু গভীর হতেই তানভীর সেই স্থানে চলে গেল, যেখানে তারা প্রতি রাতে মিলিত হয়। জাভীরাও ঠিক তখনই সেখানে গিয়ে হাজির হলো।

জায়গাটা ছিল লোকালয় থেকে দূরে। তানভীর লক্ষ্য করলো, জাভীরাকে খুব ভীত দেখাচ্ছে। তানভীর বললো, 'কি ব্যাপার জাভী! তোমাকে এত ভীত দেখাচ্ছে কেন?'

জাভীরা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললো। জাভীরা ভয়ের কারণ কিছু না বললেও একটু পরেই তানভীর বুঝতে পারলো, তার ভয় অমূলক নয়। সে নিজেই স্পষ্ট শুনতে পেলো, কে যেন জাভীরাকে খুঁজছে এবং তাকে ডাকছে।

এবার তানভীরও খানিকটা ভয় পেল। আস্তে করে জাভীরাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ লোক কে? কে তোমাকে ডাকছে?'

জাভীরা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে সাবধান করে ভীত কণ্ঠে বললো, 'চুপ, মনে হয় আমাকে কেউ দেখে ফেলেছে। হয়তো

আমি আসার পথে কেউ আমাকে আসতে দেখে আমার পিছু নিয়েছিল, এখন হারিয়ে ফেলে আমাকে খুঁজছে। চলো আমরা আরও দূরে সরে যাই।'

তারা দু'জন অন্ধকারের আড়াল নিয়ে সংগোপনে সেখানে থেকে সরে পড়লো এবং গ্রাম থেকে আরও অনেক দূরে চলে গেল। কিন্তু তখনও তারা শুনতে পাচ্ছিল, কে যেন ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার ডাকছে, 'জাভীরা, জাভীরা...!'

'এ শব্দে কান দিও না তানভীর।' জাভীরা বললো, 'আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে অন্য কারো আওয়াজ পৌঁছবে না।'

সামনে একটি ছোট পাহাড় ছিল। জাভীরা তানভীরকে দ্রুত টানতে টানতে সেই পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে গেল। তানভীর বিস্মিত হয়ে তার সাথে সাথে চলছিল। তারা এমন এক স্থানে গিয়ে থেমে গেল, যেখানে বাইরের আওয়াজ সহজে পৌঁছে না। ওখানে পৌঁছে জাভীরা বলল, 'এবার আর কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।'

সহসা তানভীর চমকে উঠে বললো, 'বাইরে খুব শোরগোল শোনা যাচ্ছে। তুমিও শুনতে চেষ্টা করো। মনে হচ্ছে কোথাও যেন ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। বহু মানুষের চিৎকার ও আর্তনাদ আর অশ্বের ছুটাছুটি শোনা যাচ্ছে!'

'তোমার কানে এরকমই শোনা যাচ্ছে হয়তো।' জাভীরা হেসে বললো, 'বাতাসের বেগ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে এমন শব্দ বের হচ্ছে। এটা চতুর্মুখী বাতাসের আওয়াজ, তুমি অযথাই অন্য রকম ভাবছো।'

'কি জানি, হতে পারে!' চিন্তিত মনে বললো তানভীর।
জাভীরা তাকে তার বাহু বন্ধনে নিয়ে নিল। তার সুবাসিত কোমল চুলের স্পর্শ আর ঘ্রাণ তানভীরের চোখ, কান ও বিবেকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিল। তানভীর শেষে মেনে নিতে বাধ্য হলো, এ শব্দ বাতাসেরই সৃষ্টি। নইলে এমন ভূতুড়ে চিৎকারের শব্দ কোত্থেকে আসবে? সে জাভীরার চুলের অরণ্যে মুখ বুঁজে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা চিৎকারের শব্দ ও ছুটন্ত ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে লাগল।
কিন্তু সে জানতে পারলো না, এ আওয়াজ তারই গ্রামের লোকদের করুণ আর্তনাদ, তারই আপনজনদের মর্মভেদী চিৎকারের আওয়াজ। সেখানে তখন সেই ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, যে ধ্বংসলীলা চালানোর আহবান নিয়ে ইহুদী বণিক গিয়েছিল সম্রাট বিলডনের বাহিনীর কাছে। জাভীরা এ ষড়যন্ত্রের সবকিছুই জানতো। সে চাচ্ছিল না, এ শব্দ তানভীরের কানে পৌঁছুক।
এ ব্যবস্থাটা হয়েছিল খুবই গোপনে। ইহুদী বণিক আর একবার সম্রাট বিলডনের কাছে গিয়েছিল। তখন সম্রাট বিলডনের সাথে তার সাক্ষাত হয়। এ সাক্ষাতেই হেমসের ধ্বংসের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছিল ইহুদী। সে বিলডনকে মুসলমানরা কিভাবে সেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে তার বিবরণ দিয়ে বলেছিল, 'যদি আপনি সেখানে অভিযান চালান তবে আমরা আপনাকে বলে দেবো, কিভাবে হামলা করলে আপনি সহজে বিজয় লাভ করতে পারবেন। কোথায় আপনি কেমন মোকাবেলার সম্মুখীন হবেন সে তথ্য আমরা আপনাকে

সরবরাহ করবো, যাতে আপনি তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। সম্রাট বিলডনের এ প্রস্তাব খুবই পছন্দ হলো। তিনি ইহুদী বণিককে বললেন, 'আমি অভিযান চালাবো।'

তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনী কোন্ রাতে গোপনে হেমসের উপর আক্রমণ চালাবে বলে দিয়ে তাকে বললেন, 'এ কথা ইহুদী বা খৃস্টান বাসিন্দাদেরও বলার দরকার নেই। তবে তোমাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোন খৃস্টান বা ইহুদী বাসিন্দা সে রাতে হেমসের গ্রামে না থাকে। যেন সন্ধ্যার পরপরই তারা গ্রাম থেকে সরে যায়। তারা দিনের বেলায় সরে গেলে মুসলমানরা সন্দেহ করবে।'

'আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। সে রাতে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে ইহুদীদের জন্য নৈশ এবাদতের ব্যবস্থা করবো। আর খৃস্টানদের প্রতিটি বাড়ীর গেটে ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখবো, যাতে আপনারা চিনতে পারেন ওটা খৃস্টানের ঘর। আর আমাদের যুবকদের একটা দল আপনাদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।'

এভাবেই তিনি হেমসের মুসলমানদের ধ্বংসের পথ তৈরী করেন। ইহুদী ফিরে এলে তার পরিকল্পনা শুনে জাভীরা বললো, 'আমি তানভীর ও তার পরিবারকে বাঁচাতে চাই।'

'একে আমরা জাতির সাথে গাদ্দারী করা বলবো।' বৃদ্ধ খৃস্টান বললো, 'সাপের বাচ্চাকে বাঁচানো কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ?'

ইহুদী বণিক বললো, 'এখানে মুসলমানদের দুটি বাড়ী আছে, যাদের সাথে আমার খুবই আন্তরিক সম্পর্ক। তোমার মত

চিন্তা করলে তাদের বাঁচানোর আবদার করতে হয় আমাকে। তুমি কি চাও, আমি তাদের রক্ষার আবেদন জানাই?'

এক খৃস্টান বললো, 'এমন বন্ধুত্ব তো আমাদেরও আছে। কিন্তু আমি তাদের কাউকেই বাঁচানোর চিন্তা করছি না। যদি আমরা মুসলমানদের রক্ত চাই, তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ভুলে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, কোন কোন মুসলমান আমার ব্যক্তিগত বন্ধু হতে পারে কিন্তু তারা আমাদের ধর্মীয় এবং জাতীয় শত্রু। যে কোন মূল্যে তাদের বিনাশই আমাদের সবার কাম্য।'

জাভীরা জেদের সঙ্গে বললো, 'কিন্তু আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই এ জন্য যে, সে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। জীবনের বদলে সে জীবনই পাওনা। সে ওই দিন আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে না আনলে এখন আমি তোমাদের সাথে তর্ক করার জন্য বেঁচে থাকতাম না।' জাভীরার কণ্ঠে উত্তাপ।

'সে তোমাকে বাঁচিয়েছে বলে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। এ জন্য আমরা তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে অস্বীকার করিনি। তুমি নিজেও জানো, তাকে আমরা এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলাম, যা সে কল্পনাও করেনি। কিন্তু তাই বলে সাপকে তো মুক্তার মালা বানাতে পারি না!'

ইহুদী বণিক বললো, 'আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। এখন সে আমাদের শত্রু, আমরাও তাদের শত্রু। যখন তার পুরস্কার পাওনা ছিল, তাই দিয়েছি। এখন আঘাত পাওনা হয়েছে, আঘাত পাবে, এ নিয়ে বিতর্কের কি

আছে?'

'আমি তাকে শত্রু মনে করি না।' জাভীরা বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমার কাছে একটাই পুরুষ এসেছে, যে আমার দেহের প্রতি সামান্য লোভও করেনি। তোমরা তো সবাই পাপিষ্ঠা। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে আমার কাছে পবিত্র বলে দাবী করতে পারো? কিন্তু সে পারে। তার নিয়ত পবিত্র। আচরণ পবিত্র। সে শুদ্ধতম এক পবিত্র পুরুষ। এমন পুরুষকে আমি পূজা করতে পারি, আঘাত করতে পারি না।'

'তুমি শুধু তানভীরকেই বাঁচাতে পারো।' জাভীরার ক্রোধ ও জেদ দেখে ইহুদী বণিক বললো, 'কিন্তু কি করে তাকে বাঁচাবে? কি ঘটতে যাচ্ছে যদি তুমি তাকে তা বলে দাও, সে কি তখন চুপচাপ বসে থাকবে? সে কি সমস্ত লোককে তা বলে দেবে না?'

বৃদ্ধ খৃস্টান বললো, 'আর তার সমস্ত পরিবারকে সরে যেতে বললে তারা কি এর কারণ জিজ্ঞেস করবে না?'

'হ্যাঁ, তাই।' অন্য একজন বললো, 'এক মুসলমানের বদলা আদায় করতে গিয়ে কি তুমি সমস্ত মুসলমানকে সতর্ক করতে চাও? যারা আমাদের জন্য বিপদের কারণ তাদের বাঁচিয়ে দিতে চাও?'

'আমাকে অত বোকা মনে করো না।' জাভীরা বললো, 'আমি কি আমার জাতিকে ভালবাসি না? জাতির জন্য আমি কি কোনই ত্যাগ ও কোরবানী করিনি? বিষয়টা আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমাকে দিয়ে কখনও খৃস্টান ও ইহুদীদের ক্ষতি হবে না।'

আক্রমণের দিন সন্ধ্যায় জাভীরা তানভীরের বাড়ী গেল। সে তাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে এলো। তানভীর জানতেই পারল না, সারা রাত তার গ্রামে কি ঘটলো। কি তুফান বয়ে গেল তার বাড়ীর ওপর দিয়ে।

রাতের অধিকাংশ সময় জাভীরা কোথায় থাকে, কোথায় যায়, তার লোকেরা সব জানতো। জাভীরা তার লোকদের জানিয়েছিল, তানভীরের সাথে ভালবাসার ভান করে সে তার কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য আদায় করছে।

ওই রাতে সে যখন তানভীরকে বাইরে নিয়ে গেল তখন গ্রামের এক ইহুদী যুবক গোপনে তাকে লোকালয়ের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখলো। যুবকটি একাকী তাকে গ্রামের বাইরে যেতে দেখে তার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর অন্ধকারে তাকে হারিয়ে ফেলল। তাই যুবকটি জাভীরার নাম ধরে বার বার ডাকছিল।

জাভীরা সে ডাক শুনে তানভীরকে নিয়ে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল। সে তাকে এতটা দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, যেখানে তাদের কানে গ্রামের লোকদের শোরগোল শোনা না যায়। জাভীরার অনুসন্ধানে যে যুবক বেরিয়েছিল, পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে তাকে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এলো যুবক।

গ্রামের লোকজন এশার নামাজের পর খেয়েদেয়ে শোয়ার উদ্যোগ করছিল। শিশুরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। খৃস্টান পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী বাহিনী গোপনে নিঃশব্দ বিড়ালের মত পা টিপে টিপে লোকালয়ের কাছে পৌঁছে গেল।

সে এলাকার লোক সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশী ছিল সৈন্যদের সংখ্যা। পদাতিক বাহিনী যখন গ্রামের কাছে এসে ঘিরে ফেলল সারা গ্রাম, তখন অশ্বারোহী বাহিনী পিছন থেকে ছুটে এলো তীব্র বেগে। তারা এসেই ঘুমন্ত মানুষের উপর তুফানের বেগে আক্রমণ করলো। অশ্বারোহীরা মশাল হাতে ছুটে গেল মুসলমানদের বাড়ী ঘরের দিকে। তারা কয়েকটি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল যাতে সারা গ্রাম আলোকিত হয়ে যায়।
খৃস্টান পদাতিক সেনারা বাড়ীর দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করলো। বেশীর ভাগ মুসলমান জেগে উঠার আগেই নিহত হলো। যারা শোরগোল শুনে জেগে উঠে হাতিয়ার নেয়ার সুযোগ পেল, বাঁচতে পারলো না তারাও। বরং অস্ত্র হাতে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলো তারা।
খৃস্টান অশ্বারোহীরা গ্রাম ঘিরে রেখেছিল। কেউ পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তার ভাগ্যে জুটতো বর্শা ও তলোয়ারের আঘাত। আর সেই আঘাত তাকে এনে দিত শহীদের মর্যাদা।
লাঞ্ছিত হচ্ছিল মেয়েরা। যারা বাঁধা দিত তারা ঢলে পড়তো মৃত্যুর কোলে। এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি শিশুরাও। মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকেও ওরা নির্মমভাবে হত্যা করতো। এই ছিল সেই চিৎকার ও আর্তনাদ, যে আর্তনাদের শব্দ পাহাড়ের পিছন থেকে তানভীর শুনতে পাচ্ছিল।
তার বাড়ীঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের সবাই নিহত হয়েছিল সেই নির্মম হত্যাযজ্ঞে। সম্রাট বিলডন এভাবেই তার হিম্মতের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল। গ্রামের নিরীহ ও ঘুমন্ত

মানুষগুলোকে হত্যা করে পুষিয়ে নিল তার ক্ষোভ ও ক্ষতির সিংহভাগ।

'তুমি আজ আমাকে এত দূর কেন নিয়ে এলে?' তানভীর জাভীরাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আজ তুমি কিছুই বলছো না যে? তুমি ভয় পাচ্ছো কেন?'

'এই কারণে যে, তুমি আমার সাথে থাকবে কিনা জানি না।'

জাভীরা খুব চালাক মেয়ে। সে বলতে লাগলো, 'আমি তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় যেতে চাই। তুমি যদি আমার সাথে না যাও তাহলে আমি একা এই অন্ধকার রাতে কেমন করে সেখানে যাবো?'

'কোথায় যাবে? কেন যাবে?'

'কেন, তোমার কি আমার উপর বিশ্বাস নেই?' জাভীরা তাকে বাহু বেষ্টনীতে নিয়ে বললো, 'আমরা কালকেই আবার ফিরে আসবো।'

তানভীর স্তম্ভিত বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। জাভীরার কথার মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

জাভীরার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা টের পাচ্ছিল তানভীর। তার মুখে কাঁধে ছড়িয়েছিল জাভীরার রেশম কোমল চুল। এটা সেই চুল, গুহায় হাত-মুখ ধুয়ে আসার পর যে চুল দেখে তানভীর প্রথম নিজের মধ্যে বিস্ময় বোধ করেছিল।

এখন তো জাভীরা তার ভালবাসা দিয়ে তানভীরকে পুরোপুরি জয় করে নিয়েছে। তানভীর তার অন্তরের গভীরে এখন সর্বদাই জাভীরার ভালবাসা টের পায়। এ ভালবাসা এখন তার কাছে নেশার মত হয়ে গেছে। যার জন্য সব সময় তার

মন উন্মুখ হয়ে থাকে। মনে হয়, এ ভালবাসার নামই জীবন। যেখানে এ ভালবাসা নেই, সেখানে জীবনেরও কোন দরকার নেই। তানভীর আকাশের তারকারাজির দিকে তাকিয়ে জীবনের এই উষ্ণ মধুর কথাই ভাবছিল।

'আমরা আর কতকাল এভাবে চোরের মত মেলামেশা করতে থাকবো?' জাভীরার প্রশ্নে ধ্যান ভাঙল তানভীরের। সেও স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করলো, 'তাইতো! আমরা আর কতকাল এভাবে চোরের মত মেলামেশা করবো?'

জাভীরা নিজেকে তানভীরের কোলে সঁপে দিয়ে বলল, 'এখন যে আমি তোমাকে ছাড়া আর চলতে পারি না। যদি তোমার অন্তরে আমার জন্য ভালবাসা থেকে থাকে তবে কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছো, আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? তুমি কি আমার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখো না?'

'জাভীরা, বিশ্বাসের কথা যদি বলো তবে বলতে হয়, আমি নিজেকে যতোটা বিশ্বাস করি, তোমাকে বিশ্বাস করি তারচে বেশী। বিশ্বাসের জন্য নয়, এমনি জানতে চাচ্ছিলাম, তুমি কোথায় যেতে চাও?'

'ধরো, তোমাকে আমি এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যেখানে আমাদের মাঝে ধর্মের কোন প্রাচীর খাঁড়া থাকবে না।'

'ধর্মের কথা তুলছো কেন? ধর্ম তো আমাদের মিলনের পথে কোন অন্তরায় নয়। আমার ধর্ম আহলে কিতাবদের মধ্যে বিয়ে বৈধ গণ্য করে। ধর্ম নয়, বলো সমাজ এটা ভাল চোখে দেখবে না।'

'তুমি পুরুষ মানুষ! তোমার কথা আলাদা। তুমি আমার দিকে তাকাও! আমি অতি দুর্বল এক মেয়ে। তারপরও শুধু তোমার জন্য কত বড় ঝুঁকি আমি নিচ্ছি তা ভাবতে পারো?'

'কি ঝুঁকি?'

'আমি তোমাকে নিয়ে দেশান্তরী হতে চাই। আর সেটা আজ এবং এক্ষুণি।'

'কেন! কেন আজই পালাতে হবে আমাদের? আমার তো মনে হয়, আমাদের পরিবার তোমার আমার মিলনকে কষ্ট হলেও মেনে নেবে?'

'দেখো, সব কিছু জানতে চেও না, সব কিছু বুঝতে যেও না। যদি তেমন কোন দরকার না হতো তবে এমন দাবী আমি করতাম না। শুধু জেনে রাখো, আজ এবং এক্ষুণি এখান থেকে আমরা পালাতে না পারলে আর কোনদিন তুমি আমাকে পাবে না।'

জাভীরার এ কথায় কেঁপে উঠল তানভীরের অন্তর। আসলে এখন দুর্বল যদি কাউকে বলতেই হয়, সে তানভীর। জাভীরা এখন তার জ্ঞান ও বিবেকের উপর কর্তৃত্ব করছিল। সে চেষ্টা করছিল, যেন তানভীর আর গ্রামে ফিরে না যায়। কারণ সে জানে, তানভীরের বাড়ী এতক্ষণে ছাই হয়ে গেছে। সেই ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে আছে তার স্বজনদের পোড়া লাশ। এ দৃশ্য তানভীর সইতে পারবে না। হয়তো এ দৃশ্য দেখলে সে পাগল হয়ে যাবে। হয়তো এর পেছনে জাভীরার ষড়যন্ত্র আছে বলে সন্দেহ করে বসবে। হয়তো সেই সন্দেহের বশে উন্মত্ত তানভীর তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। তাই

জাভীরা চাচ্ছিল, তানভীর আর গ্রামে ফিরে না যাক।

এতে কোন সন্দেহ নেই, একমাত্র ভালবাসার খাতিরেই জাভীরা তাকে এ দুর্যোগ থেকে বাঁচিয়েছে। খৃস্টানদের কাছে যদিও সে বলেছে, তাকে সসম্মানে হেমসে নিয়ে আসার ঋণ শোধ করার জন্যই সে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাকে খৃস্টানদের কবল থেকে রক্ষা করতে চায়, সেটা ছিল তাকে বাঁচানোর একটা কৌশল। সেটা ছিল বিশ্বাসযোগ্য একটা অজুহাত। কিন্তু প্রকৃত সত্য জানতো তার অন্তর। হৃদয়ে ভালবাসার ফুল না ফুটলে এসব কৃতজ্ঞতাবোধ কবেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেতো!

এই ভালবাসাই এখন তাকে প্ররোচিত করছিল তানভীরকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে। যে ভালবাসা তাকে বাধ্য করেছে তানভীরের জীবন বাঁচাতে, সেই ভালবাসাই তাকে বলছিল, 'জাভীরা, পালাও। এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও তানভীরকে। নইলে সে তার বাড়ী ঘর ও আত্মীয় স্বজনের ধ্বংস ও মৃত্যু দেখে যে কষ্ট পাবে, তার ধকল সে সইতে পারবে না। এ কষ্ট পাওয়ার কবল থেকে তাকে রক্ষা করো। পাগল হওয়ার হাত থেকে বাঁচাও তাকে। এমন সুন্দর মনের মানুষ এত ধ্বংসলীলা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।'

জাভীরার শেষ কথা, 'নইলে তুমি আর কোন দিন আমাকে পাবে না'র কোন কারণ বুঝতে পারছিল না তানভীর। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছিল, যে কোন কারণেই হোক, জাভীরা আজ অশান্ত, অস্থির। হয়তো এমন কোন কারণ ঘটেছে, যা তার জানা নেই।

তানভীর চুপচাপ বসেছিল। উঠে দাঁড়াল জাভীরা। তার হাত ধরে তাকে টেনে তুলে বললো, 'চলো।'
জাভীরা যাত্রা শুরু করলো। তানভীর তার সাথে এমনভাবে চললো, যেন তাকে কেউ জাদু করেছে। মোহগ্রস্ত মানুষের মত তাকে টেনে নিয়ে চললো জাভীরা, তানভীর বোবা মানুষের মত তার সাথে সাথে চলল।

যখন সকাল হলো তখন হেমসের গ্রামে জ্বলন্ত ছাইয়ের গাদা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেখানে কোন মুসলমানই জীবিত থাকতে পারেনি। খতিব এবং তার সঙ্গীরাও সকলেই কেউ ঘুমন্ত অবস্থায়, কেউ লড়াই করে শহীদ হয়ে গেছে।
জাভীরা তানভীরকে সঙ্গে নিয়ে খৃস্টানদের এক ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত হলো। ততোক্ষণে তানভীরের ঘোর কেটে গেছে। সে জাভীরাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কি জন্য এসেছো?'
'এতো অস্থির হচ্ছো কেন? একটু দাঁড়াও, দেখো কি করি? কেন এসেছি?'
চুপ করে গেল তানভীর। জাভীরা তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে বললো, 'তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'
সে একটু দূরে ক্যাম্পের গেটে গেল। সেখানে সে সৌভাগ্যক্রমে ক্যাম্পের এক কমান্ডারকে পেয়ে গেলো। সে কমান্ডারের সাথে কি কথা বললো তানভীর শুনতে পেলো না। কিন্তু দেখতে পেলো কমান্ডার তাকে হাতের ইশারায় কোন রাস্তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

জাভীরা ফিরে এলো তানভীরের কাছে। বললো, 'চলো।'
তানভীরকে সঙ্গে নিয়ে সে কমাণ্ডারের দেখানো পথে হাঁটা ধরলো।
এটাই ছিল সম্রাট বিলডনের ক্যাম্প। সম্রাটের তাবুও এখানেই ছিল। তখনকার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সম্রাটের তাবু রাজমহলের মতই সুসজ্জিত থাকতো। রক্ষী ও গার্ডরা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জাভীরাকে সম্রাট বিলডনের ক্যাম্পে যেতে দিল। তানভীরকে বাইরে রেখে ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে গেল জাভীরা। কিছুক্ষণ পর এক রক্ষী এসে তানভীরকেও ভেতরে ডেকে নিলো।
সম্রাট বিলডন তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'এই মেয়েটা তোমাকে তার সাথে রাখতে চায়। সে তোমার জন্য এমন ব্যগ্র যে, তোমাকে না পেলে সে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারে। আমি তার মনের ভাব বুঝতে পারছি। এ জন্যই আমি তার ইচ্ছায় বাঁধা দিতে পারছি না। আমার মনে হয়, তোমার মনের অবস্থাও একই রকম। নইলে তুমি তার সাথে এখানে আসতে না। তোমাদের দু'জনের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই আমি তার আবদার মঞ্জুর করলাম। এখন তোমরা এখানে কোন প্রকার ভয় ও সংশয় ছাড়াই থাকতে পারবে।'
'আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করবো না।' তানভীর বললো।
'তোমাকে ধর্ম পরিবর্তনের কথা কে বলেছে?' জাভীরা বললো।
'এখানে থেকে কি হবে?' তানভীর জিজ্ঞেস করলো, 'আর

এখানে আমার করার কি আছে? কেন আমি এখানে থাকবো? না, আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি আমার বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই।'

'তানভীর!' জাভীরা তার দিকে গভীর চোখে চেয়ে বললো, 'আমার দিকে তাকাও। আমি কি তোমাকে বলিনি, আমাদের দুনিয়া এখন এক হয়ে গেছে। বাঁচতে হলে আমরা দু'জন এক সাথেই বাঁচবো, মরতে হলেও এক সাথে মরবো? তুমি কি জানো, এখানে ছাড়া আর কোথাও আমার জীবন নিরাপদ নয়? মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমি এখানে ছুটে এসেছি। আমার বাবা আমাকে পেলে খুন করে ফেলবে। সে তোমার আমার মিলন মেনে নিতে পারছে না। কাল রাতে পালাতে না পারলে এতক্ষণে আমি আমার বাবার গৃহে বন্দী হয়ে যেতাম!'

তানভীর জাভীরার উত্তেজিত ও আবেগময় কথা শুনে আর কিছুই বলতে পারলো না। সে মাথা নিচু করে নিল।

ইয়াজুদ্দিনের দূত সুলতান সালাহউদ্দিনের কাছে পাঠানো চিঠির মৌখিক উত্তর নিয়ে ইয়াজুদ্দিনের কাছে পৌঁছে গেল। দুতের কাছ থেকে সব কথা শুনলেন ইয়াজুদ্দিন।

সুলতান আইয়ুবীর পরামর্শ অনুসারে ইয়াজুদ্দিন ইবনে লাউনের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। বৈঠকে তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন, 'আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করতে চাই।'

'কিন্তু আমি জানি সুলতান আইয়ুবী এদিকেই আসছেন। সম্ভবত তিনি আপনাকে সাহায্য করার জন্যই ছুটে আসছেন। এ অবস্থায় আপনি এমন প্রস্তাব কেন দিচ্ছেন?'

'যেহেতু আমি জানি, সুলতান আইয়ুবী কোন সাধারণ যোদ্ধা বা শাসক নন। তিনি যেখানেই যান সেখানেই তার শাসন কায়েম করে নেন। এখানে আমাকে সাহায্য করার নামে তিনি এলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, এখানেও তিনি তারই শাসন জারি করছেন। তখন তার মোকাবেলা করার কোন সাধ্য আমার থাকবে না। বাধ্য হয়ে আমাকে আমার শাসনভার তার হাতে অর্পণ করে দিতে হবে। অপর পক্ষে আপনি আমার প্রতিবেশী। আপনার সাথে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের না হলেও আপনি আমার রাজ্য গ্রাস করতে আসেননি। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে টুকটাক মনোমালিন্য হলেও তা পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেয়া সম্ভব। কিন্তু কোন বৃহৎ শক্তি আমাকে আজ পদানত করলে কাল ধরবে আপনাকে। এ জন্যই এ আজদাহার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র ভেদাভেদ ভুলে আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। রাজনীতিতে চিরন্তন শত্রু বা বন্ধু বলে কিছু নেই। অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে বন্ধুও কখনো শত্রু হয়ে যায় আবার শত্রু হয় বন্ধু। বাস্তবতা আজ আমাদেরকে বন্ধু হওয়ার জন্য বলছে। নইলে আমরা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।'

'কিন্তু সুলতান আইয়ুবীকে সামলাবেন কেমন করে?'

'সেটা এখনি বলতে পারছি না। যদি আপনি আমার বন্ধুত্ব কবুল করে নেন তবে আপনার সাথে পরামর্শ করেই তা ঠিক

করবো। প্রয়োজনে তাকে ধোঁকা দিয়ে এমন অবস্থায় ফেলবো যে, তিনি আমাদের এ এলাকা দখল করার সংকল্প পাল্টাতে বাধ্য হবেন। মুখোমুখি লড়াই করে খৃস্টানদের বড় বড় সম্রাটও তার কাছে হেরে গেছেন। এ অবস্থায় তাকে বেকায়দায় ফেলার একমাত্র উপায় বন্ধু বেশে তাকে কোন কঠিন ফাঁদে ফেলা।'

'আপনার চিন্তা সঠিক। আমি আপনার বন্ধুত্ব কবুল করে নিলাম। কিন্তু আপনিও স্বীকার করবেন, বিপদটা প্রাথমিকভাবে আপনার ওপরই এসে পড়ছে। এ ক্ষেত্রে আমি আপনার সহযোগী হলে এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুলতান আইয়ুবীকে নিঃশেষ বা প্রতিহত করা গেলে আমার কি লাভ হবে?'

ইয়াজুদ্দিন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। শেষে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি অযৌক্তিক কিছু বলেননি। আমাদের মিলিত চেষ্টায় আমি বেঁচে গেলে আপনারও কিছু লাভ হওয়া দরকার। আমি কথা দিচ্ছি, যদি আমরা সফল হই তবে আমি আমার শস্য শ্যামল উর্বর অঞ্চল 'কারা হেদা' আপনাকে দান করবো। আমার এ আশ্বাসের ওপর আপনার আস্থা না থাকলে এ ব্যাপারে আমি লিখিত চুক্তি করতেও সম্মত আছি।'

শস্য শ্যামল উর্বর এলাকা 'কারা হেদা'র নাম শুনেই ইবনে লাউনের মুখে আলোর আভা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, 'আপনার কথার ওপর আমার আস্থা আছে। বিষয়টা গোপন থাকলেই কেবল সুলতান আইয়ুবীকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব। তাই এ আলোচনার বিষয় কোথাও প্রকাশ করা উচিত নয়।

চুক্তিপত্র করে কোন দলীল রাখাও ঠিক নয়।'

এভাবেই ইবনে লাউনের সাথে ইয়াজুদ্দিনের এক গোপন চুক্তি হয়ে গেল। এ চুক্তির কারণে ইবনে লাউনের আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে গেলেন ইয়াজুদ্দিন।

তার কিছুদিন পরই সুলতান আইয়ুবী স্বসৈন্যে এসে কারা হেদার কাছে তার সেনা-ক্যাম্প স্থাপন করলেন। বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে সুলতানের বাহিনী খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুলতান বিশ্রামে বেশী সময় নষ্ট করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, আক্রমণে দেরী করলে ইবনে লাউনের কাছে খবর পৌঁছে যাবে যে, সুলতান আইয়ুবী স্বসৈন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সে অবস্থায় মোকাবেলার জন্য ইবনে লাউন প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে।

তিনি মনে করছিলেন, ইবনে লাউনের সাথে কঠিন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে। এই ভয়ে তিনি হলব থেকেও চুক্তি অনুসারে কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এ চুক্তি তিনি করেছিলেন আল মালেকুস সালেহকে পরাজিত করার পর।

মধ্য রাতের পর সুলতান আইয়ুবী তাঁর সৈন্যদেরকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে তিনি জেনে নিয়েছিলেন, আরমেনিয়ান সীমান্ত ফাঁড়িতে কি পরিমাণ সৈন্য আছে। তিনি সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর অবস্থানও জেনে নিয়েছিলেন। কারা হেদা পৌঁছেই তিনি ইয়াজুদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করেন। ইয়াজুদ্দিন সুলতানের সাথে দেখা করে

তাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করেন।
সুলতান আইয়ুবীর আক্রমণ ছিল ছয় দিক থেকে। ছয়টি সীমান্ত চৌকিতে ছয় গ্রুপ এক যোগে আক্রমণ করার জন্য রওনা হয়ে গেল। প্রত্যেক গ্রুপের সাথে সুলতানের নিশান বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ইয়াজুদ্দিনের লোক। কৃষ্ণ নদীর দিক থেকে যে গ্রুপটি মাখজাতুল আহামে আক্রমণ চালিয়েছিল, সুলতান আইয়ুবী ছিলেন সেই গ্রুপের সাথে।
এ নদীটি ছিল ইবনে লাউনের সীমান্ত বরাবর। ইয়াজুদ্দিনের সহযোগিতায় সুলতান নদীর উপর নৌকার পুল বানিয়ে নিলেন। নদীর অপর পারেই ছিল আর্মেনীয়দের দুর্গ মাখজাতুল আহাম। ইবনে লাউন এ কেল্লাতেই অবস্থান করছিলেন।
তাকে শেষ করতে পারলে সমস্ত এলাকাই দখল হয়ে যায়, এ কথা ভেবেই সুলতান আইয়ুবী এ গ্রুপের সাথে ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে গ্রুপের কমাণ্ড করছিলেন না, এ গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুলতান আইয়ুবীর ভাতিজা ফররুখ শাহের হাতে।
এই ফররুখ শাহও ছিলেন অসাধারণ রণকুশলী ও বীর যোদ্ধা। তিনি বীর বিক্রমে আক্রমণ করলেন মাখজাতুল আহামে। ফাঁড়ির শত্রু-সৈন্যরা এ আকস্মিক হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা বাঁধা দিয়ে তেমন সুবিধা করতে পারল না। ফররুখ শাহের বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে কেউ কেউ নিহত হলো। কতক সৈন্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য বন্দীত্ব কবুল করে নিল।

ফররুখ শাহ্ ফাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। মুহূর্তে আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ফাঁড়ির চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আতংক। সেই আতংক আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য ফাঁড়ির পাশে গড়ে উঠা বস্তিতেও আগুন ধরিয়ে দিল ফররুখ শাহের সৈনিকরা।

ইবনে লাউনের ঘুম যখন ভাঙল তখন তিনি দেখতে পেলেন সুলতান আইয়ুবীর জানবাজ সৈন্যরা রশি বেয়ে তার কেল্লার প্রাচীর টপকে ভেতরে লাফিয়ে পড়ছে। তাদেরই কয়েকজন ছুটে গিয়ে কেল্লার গেট খুলে দিল। এর আগেই মিনজানিক দিয়ে নিক্ষেপ করা পাথরের আঘাতে কেল্লার ফটক ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ফলে ফটক প্রহরীরা সরে পড়েছিল সেখান থেকে।

ইবনে লাউন দৌড়ে কেল্লার এক মিনারের উপর উঠলেন। মিনারে উঠে চারদিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। তার চোখে ভেসে উঠল সীমাহীন আগুনের লেলিহান শিখা। তিনি তখনও চিন্তা করে কোন কুলকিণারা পাচ্ছিলেন না কি ঘটছে। কারা কেল্লা আক্রমণ করেছে, এখন তিনি কি করবেন, এসব যখন ভাবছিলেন তিনি, তখনই সুলতান আইয়ুবীর এক জানবাজ সৈন্য মিনারে উঠে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিরস্ত্র ইবনে লাউন বন্দী হয়ে গেলেন। সেই সাথে আত্মসমর্পন করলো কেল্লার বাদ বাকী সৈন্য।

যখন সকাল হলো, ইবনে লাউনকে হাজির করা হলো সুলতান আইয়ুবীর সামনে। সুলতান আইয়ুবী তাকে বললেন, 'আমাদের সৈন্যরা সীমান্তের সব কটা ফাঁড়িতেই আক্রমণ

করেছে। ইতিমধ্যেই হয়তো সে সব ফাঁড়িও আমাদের দখলে চলে এসেছে। আমি জানতে চাচ্ছি, সব কটা ফাঁড়িই কি আমাদের লড়াই করে জিততে হবে, নাকি এখনো যেসব ফাঁড়ির পতন হয়নি, তুমি সে সব ফাঁড়ির সৈন্যদের হাতিয়ার সমর্পন করতে বলবে?'

'আমি তাদেরকে এখুনি অস্ত্র সমর্পন করার চিঠি দিচ্ছি। কিন্তু এ চিঠি কে তাদের কাছে বহন করে নিয়ে যাবে?'

এ সময় সামনে এগিয়ে এলেন ইয়াজুদ্দিন। বললেন, 'সুলতান, এ দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

ইবনে লাউন চিঠি লিখলেন। সেই চিঠি বয়ে নিয়ে গেল তার কাসেদ, সঙ্গে গেল ইয়াজুদ্দিনের লোক। চিঠিতে তিনি পত্র পাওয়া মাত্র সুলতানের বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পন করতে বললেন সব ফাঁড়ি প্রধানদের। পত্র পেয়ে তারা অস্ত্র সমর্পন করে দলে দলে মাখজাতুল আহাম কেল্লায় এসে সমবেত হতে লাগলো।

ইবনে লাউনের সেনাবাহিনীর সদস্যরা দলে দলে কেল্লায় এসে সমবেত হচ্ছিল। ইয়াজুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীকে বললেন, 'ইবনে লাউনের সাথে আমার একটি অলিখিত চুক্তি ছিল। যদিও এখন আর সেই চুক্তির কোন দাম নেই তবু বিষয়টি নিয়ে তার সাথে একটু আলাপ করা দরকার। আমার মনে হয়, তার সাথে আমরা নতুন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারি।'

তারা কেল্লার ভেতরেই সন্ধির শর্ত নিয়ে বৈঠকে বসলেন। আইয়ুবী ইবনে লাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'কার্যত এখানে এখন আমার কাজ হওয়া উচিত আপনার কাছ থেকে

এলাকার শাসন ভার বুঝে নেয়া। কিন্তু আপনাকে নিরস্ত্র ও বিতাড়িত করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি খুবই সহজ শর্তে আপনাকে আপনার এলাকা ফিরিয়ে দিতে চাই। আপনি কি আমার কাছ থেকে সে সব শর্ত শুনতে আগ্রহী?'

ইবনে লাউনের মনে হলো তিনি ভুল শুনছেন। বিজিত রাজ্য কেউ স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেয়, এমন কথা তিনি বাপের জন্মে শুনেননি। ভাবলেন, সুলতান তার সাথে মশকরা করছেন। বললেন, 'আপনি বিজয়ী বীর। যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আপনি রাখেন। একজন পরাজিত শাসককে আপনি নিকৃষ্ট কোন শাস্তি না দিলে সেটাই হবে আমার বড় পাওনা। আপনাকে মহানুভব বলেই জানি। আপনার সেই মহত্ব ও মহানুভবতা ক্ষুন্ন না হলেই আমি খুশী হবো। আপনি আমার জন্য কি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা শোনার মত মানসিকতা আমার এখনো আছে।'

'হ্যাঁ, এটাকে আপনি এক ধরনের শাস্তিই বলতে পারেন। আপনাকে আমি অবসর জীবন যাপনের সুযোগ দিতে চাই না। আমি কয়েকটি শর্তে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চাই।'

'কি শর্ত?' বিষণ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন ইবনে লাউন।

'এক. আপনাকে ইসলামী খেলাফতের আনুগত্য মেনে নিতে হবে। এ আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ আপনাকে বাৎসরিক নির্ধারিত হারে জিজিয়া দিতে হবে।

দুই. আপনার অর্ধেক সৈন্য আমার হেফাজতে দিয়ে দিতে হবে। ভবিষ্যতে কখনো ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবেন না।

তিন. খৃস্টান এবং ইসলাম বিরোধী কোন শক্তির সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবেন না।
চার. পার্শ্ববর্তী ইসলামী শাসকদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবেন এবং বিপদে আপদে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন।
পাঁচ. সীমান্তে আপনি চৌকি স্থাপন করতে পারবেন তবে কোন চৌকিতে কখনো দুইশতের অধিক সৈন্যের সমাবেশ ঘটাতে পারবেন না।
ছয়. মাখজাতুল আহাম দূর্গ গুড়িয়ে দেয়া হবে। আপনি আপনার অঞ্চলের মধ্যভাগে আপনার মূল কেন্দ্র বানিয়ে রাজ্য পরিচালনা করবেন, যাতে সকল অঞ্চল সমভাবে আপনার সেবা পেতে পারে।'
তিনি সানন্দে এসব শর্ত মেনে নিলেন এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক তিনি তার হারানো রাজ্য পূনরায় ফিরে পেলেন। কিন্তু এসব শর্তের ফলে ইবনে লাউন নামে মাত্র শাসক থাকলেন।
ইবনে লাউনের সৈন্যরা কেল্লার সামনে সমবেত হয়ে অস্ত্র সমর্পন করলো। সুলতান আইয়ুবী তাদের আদেশ দিলেন, 'এ কেল্লা ভেঙ্গে মিস্‌মার করে দাও, যাতে এখানে তার কোন চিহ্নও না থাকে।'
পরাজিত সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ কেল্লা ভাঙা আরম্ভ করে দিল।
সুলতান আইয়ুবী মুসাদা নামক এক পাহাড়ের কাছে তার সৈন্যদের নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি হলবের সৈন্যদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'যেমন দ্রুত

এসেছিলে তেমনি দ্রুত ফিরে যাবে।'

নিজের সৈন্যদেরকে পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে তিনি ফিরলেন ইবনে লাউনের সৈন্যদের দিকে। ইবনে লাউনের যে অর্ধেক সৈন্য তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাদেরকে ইয়াজুদ্দিনের হেফাজতে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'এদেরকে বুঝিয়ে বলো, মুসলমানরা কেন যুদ্ধ করে। রাজ্য জয় বা গনীমতের মালের জন্য যে আমরা যুদ্ধ করি না এ কথা তাদের বুঝতে হবে। তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত।'

সুলতান আইয়ুবী সব কাজ সমাধা করে ফিরে গেলেন নিজের তাবুর কাছে। কিন্তু তিনি তখনো জানতে পারেননি, তিনি যে পর্বতমালার পাশে সৈন্য সমাবেশ করেছেন, সেই পর্বতমালার ওপারে বিলডনের বাহিনী এসে পৌঁছে গেছে। তারা সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত।

ইবনে লাউনের পরাজয়ের পর সুলতান আইয়ুবী সে এলাকায় আর সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কারণ ইবনে লাউন ছাড়া সেখানে কোন শত্রু সৈন্যের ভয় বা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা ছিল না।

কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধই। কখন কেমন করে কার ঘাড়ে বিপদ লাফিয়ে পড়বে সে কথা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। অনেক সমরবিদ লিখেছেন, সুলতান আইয়ুবী যদিও জানতেন না,

সম্রাট বিলডন আশপাশেই কোথাও ক্যাম্প করে আছেন, তবু তার এতটা অসতর্ক হওয়া উচিত হয়নি। যদি বিলডন তার পরিকল্পনা মত সুলতানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পেতেন তবে এখানেও রমলার ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটতো। কিন্তু সুলতানের ওপর আল্লাহর বিশেষ রহমত ছিল, তাই এক অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।

ঘটনা হচ্ছে, সম্রাট বিলডন সময় মতই সুলতান আইয়ুবীর দিক পরিবর্তনের খবর পেলেন। তিনি তাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুশলী সেনানায়কের মতই ওঁৎ পাতলেন সুলতানের এগিয়ে যাওয়ার পথে। সুলতান যখন মুসাদা নামক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাহিনীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ দিলেন তখন বিলডন তার বাহিনী নিয়ে সেই পাহাড়ের উল্টো পাশে সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। তারপর রাতের আঁধারে তিনি তার বাহিনীকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাওয়ার হুকুম দিলেন। সন্তর্পনে সম্রাট বিলডনের বাহিনী পাহাড়ের চুড়ায় গিয়ে অবস্থান নিল। পুরো বাহিনী পাহাড়ে উঠতে এবং অবস্থান নিতে নিতেই ভোর হয়ে গেল। বিলডন সে রাতে আক্রমণ না করে পরিপূর্ণ প্রস্তুতিসহ আগামী রাতে বেপরোয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল।

সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদল পাহাড়ের পাদদেশে তাবু টানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সুলতান আইয়ুবী তখনো জানতে পারেননি, সম্রাট বিলডন তার মাথার উপর বসে আছেন। সুলতানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অস্ত্র শানাচ্ছেন।

পাহাড়ের উপর থেকে বিলডনের সৈন্যরা সুলতান আইয়ুবীর

তাবুর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তারা বিলডনকে জানাচ্ছিল সুলতানের বাহিনীর অবস্থান ও সৈন্যের পরিমাণ। এই প্রথম সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা নিষ্ক্রিয় ছিল। নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সুলতান ও তার বাহিনী।

তানভীর তখনো বিলডনের বাহিনীর সাথেই ছিল। জাভীরা তাকে বলেনি, কেন সে তাকে সঙ্গে নিয়ে বিলডনের বাহিনীর সাথে সাথে ঘুরছে। হয়তো সে তাকেও তার মত খৃস্টানদের গোয়েন্দা বানাতে চেয়েছিল।

জাভীরার মধ্যে একই সাথে বিরাজ করছিল খৃস্টানদের আনুগত্য ও তানভীরের প্রতি গভীর ভালবাসা। সম্রাট বিলডনের অবশ্য তানভীরের কোন প্রয়োজন ছিল না। জাভীরার প্রতি আকর্ষণের কারণেই তানভীরকে সে ক্যাম্পে থাকতে দিয়েছিল। জাভীরা ছিল অসম্ভব সুন্দরী। এ রূপের কারণেই বিলডন তার প্রতি ছিল আসক্ত।

একদিন জাভীরা বিলডনকে বললো, 'আমাকে আক্রার হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিন।'

কিন্তু বিলডন তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বললেন, 'হেড কোয়ার্টারের চাইতে সম্রাটের সঙ্গেই তোমাকে বেশী মানায়। কেন, আমার সঙ্গ কি তোমার খারাপ লাগছে?'

এটা সে সময়ের কথা যখন ক্যাম্প ছিল হেমসের কাছে।

একদিন গোয়েন্দারা বিলডনকে সংবাদ দিল, 'সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য বাহিনী দামেশকের পথ ছেড়ে আর্মেনীয় সীমান্তের দিকে যাচ্ছে।'

এ খবর ছিল বিলডনের জন্য অভাবনীয়। সম্রাট বিলডন

ধারণাও করতে পারেননি, সুলতান আইয়ুবী ইবনে লাউনের মত ক্ষুদ্র শক্তির ওপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছেন।

তিনি এ এলাকা খুব ভাল মতই চিনতেন। তিনি জলদি তার বাহিনী হেমস থেকে মুসাদা পাহাড়ের দিকে সরিয়ে আনলেন। তার প্ল্যান ছিল, সুলতানের বাহিনী এ পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন যাবে তখন তিনি অতর্কিত আক্রমণ করে সুলতানকে শেষ করে দেবেন।

প্ল্যান অনুযায়ী তিনি তার বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলেন। সেখানেই তিনি ওঁৎ পেতে সুলতানের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তাকে বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। ওখানে পৌঁছার পরদিনই তিনি গোয়েন্দা মারফত খবর পেলেন সুলতান আইয়ুবী ইবনে লাউনের উপর আঘাত হেনেছে। তারপর দিন খবর পেলেন, বিজয় শেষে তিনি মুসাদা পাহাড়ের পাদদেশে তাবু গেড়েছেন।

এই সে মুসাদা পাহাড়, যার অন্য পাশে অপেক্ষা করছিলেন সম্রাট বিলডন। তিনি এ খবরে খুবই উল্লসিত হলেন। ভাবলেন, একেই বলে মহাপ্রভুর কৃপা। এই দুরাচারকে ধ্বংস করার জন্য মহাপ্রভু তাকে একেবারে হাতের নাগালে এনে দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাড়াহুড়ো নয়, খুবই ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে এগুতে হবে এবার। সুলতান আইয়ুবী ও তার বাহিনী রণক্লান্ত। তারা এখন বিশ্রাম নেবে। তিনি মনে মনে এ বিশ্রামকে চির জীবনের বিশ্রামে পরিণত করার জন্য পায়তারা কষতে লাগলেন। পাহাড়ের পাদদেশে অপেক্ষমান

তার বাহিনীকে বললেন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে অবস্থান নিতে। তিনি যেদিন হেমসের নিকট থেকে ক্যাম্প তুলে সমরাভিযান চালাতে হুকুম দিলেন, সেদিন জাভীরা সম্রাটকে বললো, 'আমি তো আপনার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। আপনার সাথে অভিযানে যাওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমাকে ছুটি দিন।'

'তুমি একা কোথায় যাবে? তারচে আমার সঙ্গেই থাকো, অভিজ্ঞতা বাড়বে।'

'আমি একা যাবো কেন? তানভীর যাবে আমার সাথে। এখন তো আপনি যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছেন। ওখানে আমার বা তানভীরের কোন কাজ নেই। শুধু শুধু আমাদেরকে টেনে আপনার কি লাভ?'

'জাভীরা, আমার লাভ আমি বুঝি। লাভ-লোকসানের হিসাব আমাকে বুঝাতে এসো না। তুমি ভাল করেই জানো, আমার কাছে মেয়ে মানুষের কোন কমতি নেই।' বিলডন বললেন, 'কিন্তু তুমি এমন এক মেয়ে, যে আমার মন জয় করেছো। তুমি যখন আমার কাছে থাকো তখন আমি আত্মায় শান্তি পাই। তুমি আরও কিছুদিন আমার সাথেই থাকো।'

জাভীরা সম্রাট বাদশাহদের মেজাজ মর্জি ভাল মতই বুঝতো। বিলডনের নিয়ত বুঝতেও তার কষ্ট হয়নি। সে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল, 'আত্মার শান্তির কথা যদি বলেন তবে সে শান্তি আমি ওই মুসলমান লোকটির কাছে থেকে পেয়েছি, যার পরিবার ও বংশকে আমি ধ্বংস করেছি। তার পুরো গ্রাম ধ্বংস করে, আপনজনদের হত্যা করে, এখন তাকে আমি সঙ্গে নিয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এখনো তাকে বলতে পারিনি, আমি তোমাকে নির্বংশ করেছি, তোমার গ্রাম ও বাড়ীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। আমি যে পাপ করেছি সে পাপের প্রায়শ্চিত্য কিভাবে করবো এ চিন্তায় বিবেকের দংশনে মরে যাচ্ছি আমি। তাইতো তার সামান্য সেবা করতে পারলে আমি আমার আত্মায় শান্তি পাই।'

'তোমারও কি আত্মা এবং বিবেক আছে!' বিলডন বিদ্রুপের স্বরে বললেন, 'তোমাদের আবার মন কি? এতকাল মুসলমান আমীরদের সঙ্গ দিয়ে যে পাপ করেছো, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্যের কথা চিন্তা করেছো?'

সম্রাটের এ কথায় আহত হলো জাভীরা। বললো, 'আপনার কাছে আমি একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেহ ছাড়া আর কিছু নই! কিন্তু যখন আমি তানভীরের কাছে থাকি তখন মনে হয়, আমিও একজন মানুষ। আমারও মন আছে, আত্মা আছে, বিবেক আছে। আমার আত্মাও অন্যদের মত একটু শান্তি চায়, একটু ভালবাসার জন্য কাঙালের মত তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে! সেই শান্তি ও ভালবাসা আমি পাই তানভীরের কাছে গেলে।'

বিলডন একজন সম্রাট! সম্রাটের মতই তার আচরণ। জাভীরার কথা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'ভুলে যেও না জাভীরা, তুমি একজন সম্রাটের সাথে কথা বলছো। আমার হুকুম স্পষ্ট, তুমি আমার সাথেই থাকবে।'

ক্ষিপ্ত বিলডন এতেই শান্ত হলেন না। তিনি প্রহরীকে ডেকে বললেন, 'ওই মুসলমান লোকটার পায়ে শিকল বেঁধে তাকে

বন্দী করে রাখো।'

যখন বিলডন মুসাদা পাহাড়ের উপরে ক্যাম্প করে আইয়ুবীর ওপর হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনও তানভীর শিকলপরা এক কয়েদী! জাভীরার পায়ে শিকল না থাকলেও কয়েদীর চাইতে ভাল ছিল না তার অবস্থাও। রক্ষীরা তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

সেনাবাহিনী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে। সম্রাট বিলডন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন সৈন্যদের কাজ। এক সময় ক্লান্ত হয়ে তাবুতে ফিরে এলেন। মনে পড়লো জাভীরার কথা। তিনি জাভীরার ছটফটানি দেখতে চাইলেন। মানুষর ওপর অত্যাচার করার বিকৃত মানসিকতা নিয়ে তিনি প্রহরীকে বললেন, 'তানভীর নামের বন্দী মুসলমানটাকে নিয়ে এসো। ও কি নামেই মুসলমান, নাকি ঈমানও আছে একটু পরখ করে দেখি। আর জাভীরাকে পাঠিয়ে দাও আমার তাবুতে।'

প্রহরী জাভীরাকে সম্রাটের হুকুম জানিয়ে দিয়ে তানভীরকে হাজির করলো সম্রাটের সামনে।

জাভীরা আগেই বিলডনের তাবুতে হাজির হয়েছিল। তানভীরকে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রহরী। সম্রাট বিলডন উঠে চাবুক হাতে গিয়ে দাঁড়ালেন তানভীরের পাশে। তারপর শপাং করে চাবুকের একটি আঘাত হানলেন তানভীরের পিঠে। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। তার চাইতে অধিক বিকৃত চেহারা হলো জাভীরার।

প্রথমে ধীর লয়ে এবং পরে আস্তে আস্তে লয় দ্রুত করলেন

বিলডন। চাবুকের ক্রমাগত কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তানভীরের দেহ। তানভীরের বেদনার্ত চিৎকারের ধ্বনিতে বিষাক্ত হয়ে উঠল তাবুর বাতাস। যন্ত্রণাবিদ্ধ হরিণীর মত বিলাপ শুরু করলো জাভীরা।
বিলডন চাবুক থামিয়ে জাভীরাকে বললেন, 'তুমি আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। আমি তোমার ঝগড়া করার মজা বুঝাচ্ছি। সামান্য এক নষ্টা গোয়েন্দা, সে কিনা আমার সাথে ঝগড়া করে!'
তানভীর একেবারে বোবা ও বধির হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না, কি কারণে হঠাৎ করে তার ওপর এ নির্যাতন হচ্ছে। জাভীরার চিৎকার ও আহাজারীতে সে বুঝতে পারছিল, জাভীরাও তারই মত মজলুম, তারই মত অসহায়। কিন্তু কেন হঠাৎ করে এ অসহায়ত্ব তাকে চেপে ধরলো, কিছুতেই তা অনুমান করতে পারল না।
তানভীর তখনো সহ্য করে যাচ্ছিল এ অত্যাচার। কিন্তু জাভীরার সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে বিলডনের কাছে ছুটে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি যেমন চাইবে, যতক্ষণ চাইবে তোমার কাছেই থাকবো, দয়া করে তানভীরকে ছেড়ে দাও।'
বিলডন থামলেন। প্রহরীকে ডেকে বললেন, 'একে নিয়ে যাও। এর বাঁধন খুলে দিয়ে চিকিৎসককে বলো এর ক্ষতে মলম পট্টি দিতে। এর চিকিৎসায় যেন কোন রকম ত্রুটি না হয়।'
প্রহরী তানভীরকে বাইরে নিয়ে গেলো। বিলডনের রাগ

থামাতে তার হাতে মদের পেয়ালা তুলে দিল জাভীরা। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন সম্রাট বিলডন। এক সময় মদের নেশায় মাতাল বিলডন জড়িত কণ্ঠে জাভীরাকে বললেন, 'যদি আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে তানভীরের মত শিকল পরিয়ে তোমার সামনে হাজির করি, তবে কি তুমি খুশী হবে? বলো, তখনো কি তুমি আমাকে বুড়ো বলে তিরস্কার করবে, ঘৃণা করবে?'

'তখন আমি গর্ব ভরে বলবো, আমি সম্রাট বিলডনের সামান্য এক দাসী।' জাভীরা বললো, 'আরও বলবো, তলোয়ার নিয়ে বাহাদুরী করার দরকার নেই সম্রাট। এবার তলোয়ার আমার পদতলে রেখে দিয়ে আমার কাছে এসে বিশ্রাম নিন। আমাকে আপনার সামান্য সেবা করার সুযোগ দিন।'

'দু'দিন পরে আমি তোমাকে তাই করে দেখাবো।' বিলডন বললেন।

'তুমি কি দেখছো না, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আমার পদতলে ক্যাম্প করে বসে আছে?' বিলডন বললেন, 'কালই আমি রাতের আঁধারে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। এমন আক্রমণ করবো, যার মোকাবেলা করার সাধ্য তার হবে না।'

'আইয়ুবীকে এত হালকাভাবে নেবেন না।'

'আইয়ুবীকে আমি হালকাভাবে নিচ্ছি না। কিন্তু রণক্লান্ত আইয়ুবী এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি জানেন না, তার মাথার ওপর আমরা বসে আছি। আক্রমণ করার পর তিনি যখন জানতে পারবেন, ততোক্ষণে তিনি আমার বন্দী হয়ে যাবেন।'

তানভীরের জখমে মলম পট্টি বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই। সে এখন আর বন্দী নয়, ফলে কোন প্রহরী তাকে পাহারাও দিচ্ছিল না। সে বিছানায় উঠে বসলো এবং তাবুর দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল।

সে থাকলো কি চলে গেলো এ নিয়ে বিলডন বা তার বাহিনীর কারো কোন মাথাব্যথা ছিল না। বরং সে শাহী মেহমান হিসেবে সবার কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার কোন চিন্তা তখনো তার মাথায় আসেনি।

বিলডন আবার সৈন্যদের কাজ তদারক করার জন্য বেরিয়ে গেলেন। জাভীরা এ সুযোগে তানভীরকে দেখতে তার তাবুতে গেল। তানভীর তাকে অধীর হয়ে স্বাগত জানালো, কিন্তু জাভীরার আচরণে কোন উচ্ছ্বাস বা আবেগ নেই। জাভীরা ধীর পায়ে তার কাছে গিয়ে বসলো। তানভীর ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, 'কি হয়েছে জাভী?'

জাভীরা তেমনি উচ্ছ্বাসহীন কণ্ঠে বললো, 'আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। বেশী কথা বলার সময় নেই, যা বলছি সব মনের ভেতর গেঁথে নাও।' জাভীরা বললো, 'আমি তোমাকে তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে এসেছি। আমি তোমাকে যা বলবো বিনা প্রশ্নে তাই তোমাকে মেনে নিতে হবে। দয়া করে আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করবে না আমাকে।'

তানভীর হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জাভীরা কথা বন্ধ করে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল। এরপর মুখ তুলে বলল, 'আমি জীবনে বহু পাপ করেছি।

তোমাদের এলাকা হেমস ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে তুমি আর কোনদিন যাবে না। সেখানে শুধু ধ্বংসস্তুপ পড়ে আছে। সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তোমার আপনজনদের হাঁড়গোড় ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাবে না।'

সে তানভীরকে তার এলাকা ধ্বংসের সমস্ত বিবরণ শোনাল। তাকে খুলে বলল বিলডনের বাহিনীর বর্বরতা ও নৃশংসতার কাহিনী। তারপর বললো, 'এ নৃশংসতার প্রতিশোধ নিতে হবে। আজ রাতেই এ পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবে তুমি। এমনভাবে যাবে যেন তোমাকে কেউ দেখতে না পায়। পাহাড়ের উল্টো পাশে নেমে যাবে তুমি। ওখানে দেখতে পাবে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাহিনীর তাবু। ওরা ওখানে বিশ্রাম নিচ্ছে।

সেখানে গিয়ে তুমি সোজা সুলতানের সাথে দেখা করতে চাইবে। তাঁকে বলবে, খৃস্টান বাহিনী আপনার মাথার উপর বসে আছে। আজ মধ্য রাতের পরপরই তারা আপনার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে।'

জাভীরা তাকে সম্রাট বিলডনের যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা বলে দিয়ে আবার বললো, 'এখন আর আমার দিকে তাকাবে না, তাকালে আর বের হতে পারবে না। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আমাদের দু'জনের ঠিকানা দু'দিক থেকে এসে একই মোহনায় মিলিত হয়ে গেছে। আজ তোমাকে যে কথা বললাম, তা না হলে কোনদিনই তুমি তা জানতে পারতে না। যাও, নিজের জাতিকে বাঁচাও। যদি আল্লাহর মঞ্জুর থাকে তবে আবারও আমাদের দেখা হবে। আর যদি এ দেখাই আমাদের

শেষ দেখা হয়, তবে আমি সেখানে বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, যেখানে এ পৃথিবীর নোংরা মানুষগুলোর হাত কোনদিন পৌঁছতে পারবে না।'

যদি জাভীরা তাকে হেমসের ধ্বংসযজ্ঞের কথা ও নির্মম গণহত্যার কাহিনী না শোনাতো তবে তানভীর এত জলদি সেখান থেকে বের হতো না। জাভীরার কথা শুনে তার চোখে নেমে এসেছিল অশ্রুর বন্যা। জাভীরা তার চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললো, 'যাও, দেরী করো না। দেরী করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিলডন ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার মুসলমান ভাইদের ওপর। প্রস্তুত হওয়ার আগেই নিভে যাবে তাদের অনেকের জীবন প্রদীপ।'

তানভীর কোন কথা বলল না। জাভীরার হাত থেকে নিজের হাতটা আস্তে টেনে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। বেরিয়ে গেল তাবুর বাইরে। জাভীরা দু'হাতে মুখ ঢেকে লুটিয়ে পড়লো তানভীরের বিছানায়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার একটু গভীর হতেই সে পাহাড়ের ওপর থেকে উল্টো দিকে পা বাড়াল। সাবধানে চুপি চুপি নেমে যেতে লাগলো নিচের দিকে।

গভীর রাত। নৈশ প্রহরী এক আগন্তুককে ধরে সুলতানের সামনে হাজির করলো। সুলতান যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কে যুবক? এখানে কোত্থেকে কেমন করে এলে?'

সে ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, 'সুলতান, আমার পরিচয়

দেয়ার মত সময় আমার হাতে নেই। বিলডনের বাহিনী পাহাড়ের ওপর চড়ে বসে আছে। একটু পরই তারা আপনার ও আপনার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিলডন স্বয়ং এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আগে নিজেদের সামলানোর ব্যবস্থা নিন, আমার পরিচয় আমি আপনাকে খুলে বলছি।'

সুলতান আইয়ুবী তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। জবাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে সব সেনা কমাণ্ডার ও সেনাপতিদের ডাকলেন তিনি। তাদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করলেন।

হুকুমনামা জারি করেই তিনি আবার তানভীরের দিকে ফিরলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বলো তুমি কে এবং কোত্থেকে কেমন করে এখানে এলে? বিলডন যে পাহাড়ের ওপর চড়ে বসেছে এ তথ্যই বা তুমি পেলে কি করে?'

সুলতান আইয়ুবী তার সমস্ত কাহিনী খুব ধৈর্য সহকারে শুনলেন। তিনি বিলডনের সৈন্যদলের অবস্থান ও পরিকল্পনা সম্পর্কেও নানা তথ্য প্রশ্ন করে করে জেনে নিলেন। তারপর তাকে নিয়ে তাবুর বাইরে এলেন। বললেন, 'চলো দেখি এদিকের প্রস্তুতি কতদূর এগোলো?'

সম্রাট বিলডন রাতের তৃতীয় প্রহরে অতি সন্তর্পনে এসে সুলতান আইয়ুবীর সেনা ক্যাম্পে হামলা চালালেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গেলেন, সেখানে শুধু তাবুই আছে, কোন সৈন্য নেই। হতভম্ব বিলডন রাতের অন্ধকারে চারদিকে তাকালেন। চারদিকে ছোট ছোট টিলা, ঝোপঝাড়, কিন্তু কোথাও কোন সৈন্যের অস্তিত্ব নেই।

এ সময়ই এক দিক থেকে ছুটে এলো একটি সলতেওয়ালা তীর। বিলডনের বাহিনী তখন সুলতান আইয়ুবীর ক্যাম্পের তাবুগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

তীর সুলতানের সৈনিকদের এক তাবুতে গিয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল চারদিক থেকে অবিরাম তীরের বর্ষণ। এ সব তীর আইয়ুবীর সৈন্যদের তাবু ও জায়গায় জায়গায় জড়ো করে রাখা শুকনো খড়ের গাদায় গিয়ে আঘাত হানলো। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জ্বলে উঠলো দাউ দাউ অগ্নিশিখা।

এসব তীরের সলতে পেট্রোল জাতীয় তেলে ভিজানো ছিল। ফলে মুহূর্তে আইয়ুবীর পুরো ক্যাম্প একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে গেল। বিলডনের বাহিনী সেই আগুনের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

বিলডন এ অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্য ছুটে পালালেন। তার সৈন্যরাও পড়িমড়ি ছুটছিল। আক্রমণ দূরে থাক, আত্মরক্ষার কোন পথও তারা খুঁজে পাচ্ছিল না।

ভোর হতেই আইয়ুবীর সৈন্যরা ছুটলো পাহাড়ের চূড়ায় এবং নানা টিলা ও গহবরে। বিলডনের লুকানো সৈন্যদের ধরে ধরে এক জায়গায় জড়ো করা হলো তাদের।

সম্রাট বিলডনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। যখন বিলডন বুঝতে পারলেন, তিনি সুলতান আইয়ুবীকে অজ্ঞাতে আক্রমণ করতে পারেননি, বরং সুলতান আইয়ুবীর পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন, তখন তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তিনি কোনমতে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে গেলেন এবং নিজের রক্ষী

বাহিনী নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন অজানার উদ্দেশ্যে। পাহাড়ে উঠার পথে দু'টি তীর তার দুই দেহরক্ষীকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। অন্ধকারের জন্য সুলতানের সৈন্যরা বুঝতে পারেননি, সম্রাট বিলডন তার রক্ষী বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা তাকে মরিয়া হয়ে ধাওয়া করার প্রয়োজন বোধ করেনি, নইলে ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হতো।

১১৭৯ সালের অক্টোবর মাসে (হিজরী ৫৭৫) এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সম্রাট বিলডন অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও তার বাহিনী তছনছ হয়ে যায়। বহু সংখ্যক সৈন্য মারা পড়ে, কিছু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, বাকীরা সুলতান আইয়ুবীর ঝটিকা বাহিনীর হাতে পরাজিত ও ধৃত হয়। এভাবেই সুলতান আইয়ুবী তাঁর রমলার রণক্ষেত্রের পরাজয়ের জবাব দিলেন। এ যুদ্ধ সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য বাহিনীর মনে নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলো।

তানভীর যোগ দিল সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীতে। কিন্তু জাভীরা? জাভীরা কোথায় তার কোন হদিস পেলো না তানভীর। শুধু তার আত্মত্যাগের ইতিহাস ও স্মৃতি বুকে লয়ে ময়দান থেকে ময়দানে ছুটে চলল হেমসের বীর।

নুরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রাজিয়া খাতুনকে তাঁর চাকরানী এসে সংবাদ দিল, 'এক মহিলা গেটে এসে বলছে তার নাম শামসুন্নেসা। তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

খবরটি শুনে রাজিয়া খাতুনের চোখ স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ করে শামসুন্নেসা নামটি শুনেই তাঁর হৃদয়ে ঝড় উঠল। এ ঝড়ের গতি বুঝে নেয়া সম্ভব ছিল না দাসীর পক্ষে।

রাজিয়া খাতুনের চোখ দুটি বেয়ে তখন নেমে এসেছে অশ্রুর ধারা। কে এই মেয়ে? এই কি তাঁর একমাত্র আদুরে কন্যা শামসুন্নেসা! যে মেয়ের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছিল যখন মেয়ের বয়স মাত্র নয় বছর!

'কোন শামসুন্নেসা! কেন দেখা করতে চায়?' আবেগ সংযত করে বললেন তিনি।

'বলছেন, উনি নাকি আপনার একমাত্র কন্যা।'

রাজিয়া খাতুনের চোখে ভেসে উঠল সাত বছর আগের একটি ঘটনা। তিনি ভেবে দেখলেন, এতদিনে নিশ্চয়ই সে মেয়ে শাহজাদীর মত রূপসী হয়ে উঠেছে। কারণ এর মধ্যে কেটে গেছে দীর্ঘ সাতটি বছর, যার একটি দিনও তাঁর অন্তরের রক্তক্ষরণ বন্ধ থাকেনি। এতদিন পর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ষোড়শী কন্যা, খবরটি শুনে দৌড়ে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরার কথা। কিন্তু না, তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো ভিন্নতর উচ্চারণ। রাগতঃ স্বরে তিনি বললেন, 'কেন এসেছে? কি চায় সে আমার কাছে?'

'আপনার সাথে একটু দেখা করতে চায়। আমি কি তাকে ভেতরে আসতে বলবো?'

মা নিরব হয়ে গেলেন। দাসী তাঁর উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে রইলো নির্বাক হয়ে। মা বললেন, 'তাকে বলো, আমি তার সাথে দেখা করবো না। সে ফিরে যাক তার বিশ্বাসঘাতক

ভাইয়ের কাছে। আমার সামনে আসার সাহস যেনো আর কোনদিন না করে।'

ভেতর থেকে রাজিয়া খাতুনের পুরনো দাসী এসে দাঁড়াল মায়ের সামনে। বললো, 'মা, তখন তো এ মেয়ে অবুঝ শিশু ছিল। ভাই তাকে সঙ্গে করে যখন নিয়ে যায় তখন কি সে জানতো তার ভাই তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এখন মেয়ের বয়স হয়েছে। মায়ের সন্তান ফিরে এসেছে মায়ের কোলে। তাকে আপনি এভাবে ফিরিয়ে দেবেন?'

'আমি জানি তার ভাই-ই তাকে এখানে পাঠিয়েছে।' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'আর আমি এটাও জানি, কেন আমার গাদ্দার ছেলে নিজে না এসে তার বোনকে পাঠিয়েছে। আমি এ মেয়ের সাথে দেখা করবো না।'

রাজিয়া খাতুন। এক মহিয়সী নারী। নুরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী। নুরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁর আমীর, উজির এবং কিছু সংখ্যক সামরিক নেতা তাদের সুবিধার জন্য জঙ্গীর নাবালগ সন্তান আল মালেকুস সালেহকে সুলতান ঘোষণা করলে মা হয়ে তার বিরোধিতা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন এ মহিলা। যাঁর স্বামী ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার সংগ্রামে ছিলেন অকুতোভয় বীর সিপাহসালার, কি করে তিনি স্বার্থান্ধ মহলের সাথে হাত মেলাবেন? তাইতো তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। সুলতান আইয়ুবীকে সবকিছু জানিয়ে আহবান জানিয়েছিলেন আল্লাহরওয়াস্তে এর প্রতিবিধান করতে।

যখন আল মালেকুস সালেহকে সুলতান ঘোষণা করা হয়

তখন তার বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। আর তার ছোট বোন শামসুন্নেসার বয়স মাত্র নয়।

এ ষড়যন্ত্রের ফলে মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর রাজ্যের বিভিন্ন আমীর ও কেল্লার অধিপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাগদাদ খেলাফতের অধীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। তারা নামে মাত্র আল মালেকুস সালেহ্‌কে ক্ষমতায় বসিয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাতে থাকে। আর এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবচে সোচ্চার ভূমিকা রাখেন যিনি তাঁর নাম রাজিয়া খাতুন, সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর যোগ্য সহধর্মিনী।

সে সময় ষড়যন্ত্রকারীরা সবাই মিলে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে এক সামরিক জোট গঠন করেছিল। সুলতান আইয়ুবী তখন মিশরে।

মরহুম জঙ্গী এবং সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল, তারা রাজকীয় বিলাসিতা, আমোদ ফুর্তি ও নিজের অর্জিত সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যয় করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করে রেখেছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার নামে ক্রমাগত ক্রুসেড বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে তাঁরা মুসলমানদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। ফিলিস্তিন মুক্ত করা এবং ইসলামী রাজ্যের সীমানা বাড়ানোর নাম করে তারা মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছেন।

এ বিদ্রোহী ঐক্যজোটকে পূর্ণ সহযোগিতা ও মদদ জোগাচ্ছিল খৃস্টানরা। তারাই সরবরাহ করছিল বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও মদদ। চিত্তবিনোদনের জন্য নেশা ও বিলাসদ্রব্য সরবরাহ করছিল অকাতরে। আমোদ ও ফুর্তির যাবতীয় উপকরণ, সোনাদানা ও হীরা জহরত দিয়ে তারা ওইসব বিলাসী আমীরদের ঈমান কিনে নিয়েছিল। তাদেরকে বিপথগামী করার জন্য এরপর পাঠালো সুন্দরী মেয়েদের। খৃস্টানদের পাঠানো এসব মেয়েরা আমীরদের মনোরঞ্জনের সাথে সাথে তাদের কাছ থেকে লুটে নিচ্ছিল খৃস্টানদেরই পাঠানো মূল্যবান সোনাদানা ও হীরা জহরতগুলো।

নুরুদ্দিন জঙ্গী মারা গিয়েছিলেন। এখন বাকী শুধু সুলতান আইয়ুবী। তাঁকে পরাজিত করতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না। কেউ আর তাদের ভোগের পথে বাঁধা দিতে আসবে না। এ জন্যই তারা সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করার দৃঢ় সংকল্প করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মরহুম জঙ্গীর অর্ধেকের বেশী সৈন্যকেও তারা চাকরী দিয়ে বিদ্রোহী গ্রুপে টেনে নিয়েছে।

খৃস্টানদেরও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। তারাও মরহুম জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবীর ভয়ে ভীত ছিল। জঙ্গীর তিরোধানের পর এ ভয় কিছুটা কমলেও তখনো আতঙ্ক হয়ে বিরাজ করছিল সুলতান আইয়ুবী। তারা সুলতান আইয়ুবীর মসজিদুল আকসা মুক্ত করার সংকল্পের কথা জানতো। আইয়ুবীকে বিদায় করতে পারলে তাদের এ ভয় তো দূর হয়-ই, সেই সাথে মুসলিম অঞ্চলে নতুন করে অভিযান চালানোর পথেও আর

কোন বাঁধা থাকে না। তাই তারা অকৃপণ হাতে বিলাসী আমীরদের সহায়তা করে যাচ্ছিল।

সুলতান আইয়ুবী যখন মরহুম জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রাজিয়া খাতুনের চিঠি পেলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পারলেন তখন তিনি মাত্র সাতশ অশ্বারোহী নিয়ে কায়রো থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অভিযানে। তিনি দামেশকে প্রবেশ করলে দামেশকের নগরবাসী তাকে সম্বর্ধনা জানালো এবং সবাই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলো। দামেশকের প্রধান বিচারক শহরের চাবি তুলে দিলেন তাঁর হাতে। কিন্তু বিদ্রোহী গ্রুপের সৈন্যরা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা তাঁর শহরে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে শুরু হলো লড়াই। কিন্তু এ ছিল এক গৃহযুদ্ধ। সুলতান বেপরোয়া আঘাত হেনে মুসলমানদের ব্যাপক রক্তপাত ঘটানোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরুপায়। এসব বিদ্রোহীদের দমন করতে না পারলে ইসলামী সালতানাত ধ্বংস হয়ে যাবে।

নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী সুলতান আইয়ুবীর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। তিনি যে কোন মূল্যে স্বামীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এক রাতের লড়াইতেই জনসমর্থনহীন বিদ্রোহীরা পরাজিত হলো। রাতারাতি আল মালেকুল সালেহ ও তার সঙ্গী আমীর এবং সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যরা রণে ভঙ্গ দিয়ে দামেশক থেকে পালিয়ে হলবের দিকে পা বাড়াল।

এই পালানোর সময়ই আল মালেকুস সালেহ তার আদরের ছোট বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। যে সব আমীর ও

কেল্লাধিপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল তাদের মধ্যে হারানের কেল্লাধিপতি গুমাস্তগীন ও মুসেলের আমীর সাইফুদ্দিন গাজী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। তারাই আল মালেকুস সালেহকে হলবে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা করেছিল। আল মালেকুস সালেহ হলবে গিয়ে হলবকেই তার রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা দেয়। পরে এ শহরই ঐক্যজোটে শামিল সম্মিলিত বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে রূপান্তরিত হয়। সাইফুদ্দিন এবং গুমাস্তগীনের বাহিনীও শামিল হয়ে যায় এই সম্মিলিত কমান্ডে। এদের প্রধান উপদেষ্টা এবং উপকারী বন্ধু হিসেবে আবির্ভূত হয় খৃস্টান প্রতিনিধিরা। তারাই তাদেরকে সব ধরনের পরামর্শ এবং অস্ত্র ও রসদের যোগান দিতে শুরু করে। সেই সাথে আমদানী করে মদ ও মেয়ে মানুষ। এসব মেয়েরা ছিল খৃস্টানদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। প্রকারান্তরে তখন দেশের শাসনভার খৃস্টান উপদেষ্টা এবং এইসব গোয়েন্দাদেরই করায়ত্ব ছিল। তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো বিদ্রোহী মুসলিম আমীরদের সকল সিদ্ধান্ত। তারা গোপনে খৃস্টান কমাণ্ডো এবং দুষ্কৃতকারীদের জাল পাততে থাকলো মুসলিম প্রতিটি পরগণায়।

সেই সাথে শুরু হলো তাদের মিশনারী প্রচারণা। তারা এমনভাবে কাজ শুরু করলো যাতে মানুষের মনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এভাবেই আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের শক্ত আন্দোলন গড়ে উঠে। সুলতান আইয়ুবী দামেশক অধিকার করার পর এবং জঙ্গীর নাবালগ পুত্র আল মালেকুস সালেহ হলবে পালিয়ে গেলেও

নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রাজিয়া খাতুন দামেশকেই অবস্থান করতে থাকেন। তিনি সেখানে চুপচাপ বসে না থেকে মেয়েদেরকে যুদ্ধের ট্রেনিং দিতে লাগলেন। ছোটখাট নিরাপত্তামূলক কাজে মেয়েদের ব্যবহার করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিলেন।

তিনি ছিলেন খুবই করিৎকর্মা এবং উদ্যমী মহিলা। শারীরিক দিক থেকেও ছিলেন শক্তসামর্থ। বয়সের দিক থেকেও বুড়িয়ে যাননি, মাত্র দুই সন্তানের মা হওয়ার পরই তার স্বামী নুরুদ্দিন জঙ্গী মারা যান। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, বিদ্রোহীরা তার দুটি সন্তানই তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দুই মাসুম শিশুকে হারিয়ে বুকে পাথর বেঁধে দিন গুজরান করেছেন তিনি। সহ্য করেছেন অন্তরের অসহ্য রক্তক্ষরণ। মাঝেমধ্যে সন্তানদের এক নজর দেখার প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠতো তাঁর মনে। তখন নিজেকে তিনি বার বার এই বলে শান্তনা দিতেন, 'আমার দুই সন্তানই মারা গেছে।'

কিন্তু মায়ের মমতা এমন এক জিনিস, কোনকিছু দিয়েই যা ধ্বংস করা যায় না। তাই মাঝেমধ্যেই বুকের ভেতরটা তাঁর হাহাকার করে উঠতো। মমতার বরফ গলে অশ্রু হয়ে তা গড়িয়ে পড়তো সবার অলক্ষ্যে।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর গোয়েন্দাদের হলব, হারান ও মুশেলে পাঠিয়ে দিলেন সর্বশেষ খবর ও তথ্য সংগ্রহের জন্য। তারা ওইসব অঞ্চল থেকে ভয়ংকর সব খবর পাঠাতে লাগল। তারা জানাল, প্রতিটি অঞ্চলেই সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জোরেশোরে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে। তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ

দিচ্ছে খৃস্টান সেনা অফিসার ও উপদেষ্টাবৃন্দ।

সুলতান আইয়ুবী মিশরে খবর পাঠালেন আরো সেনা প্রেরণের জন্য। দামেশকের সেনাবাহিনীর একটা বড় দলও তাঁর বাহিনীর সাথে শামিল হয়ে গিয়েছিল। নতুন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও প্রস্তুত হচ্ছিল সুলতানকে সহযোগিতা করতে।

তিনি প্রথমে সকল বিদ্রোহীদের কাছে কাসেদ মারফত এই পয়গাম পাঠালেন, 'ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি। একজন মুসলমান হিসাবে খৃস্টানদের হাতের খেলার পুতুল হওয়া তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না। এমন কাজ কেবল বেঈমান ও গাদ্দাররাই করতে পারে। যদি তোমাদের দীলে ঈমানের আলো এখনো থেকে থাকে তাহলে খৃস্টানদের বিদায় করে দাও তোমাদের দরবার ও এলাকা থেকে। তার পরিবর্তে এসো আমরা আবার সবাই আশ্রয় গ্রহণ করি ইসলামের ছায়াতলে। আবার আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা ভুলে এক হয়ে যাই। ইসলামের স্বার্থে যদি আমরা আবার এক সঙ্গে মিলিত হতে পারি তবে খৃস্টানদেরকে মুসলিম এলাকা থেকে বিতাড়িত করাই কেবল সম্ভব নয়, চাই কি আমরা ইউরোপ এবং স্পেনের দিকেও অগ্রসর হতে পারবো। আমি ইসলামের এই অগ্রযাত্রায় শামিল হওয়ার জন্য তোমাদেরকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।'

কিন্তু আল মালেকুস সালেহ, গুমাস্তগীন বা সাইফুদ্দিন কেউ এ আহবানে সাড়া দিল না। গাদ্দাররা সুলতান আইয়ুবীর দূতকে বিদ্রুপ করে বলল, 'তোমাদের সুলতানকে রাজ্য জয়ের

নেশায় পেয়ে বসেছে। ওই নেশায় কেবল রক্ত আর প্রাণের বিনাশ ঘটে। তারচে তোমাদের সুলতানকে গিয়ে বলো, আমাদের মতো মদের নেশা করতে। তাতে জীবনের ঝুঁকি নেই, বরং আছে সুন্দরী নারীর সান্নিধ্যের মাতাল করা আমেজ। এই মধুর আমেজ রেখে আমরা কেন অযথা তার সাথে মরতে যাবো?'

এ উত্তর নিয়েই ফিরে এলো সুলতানের পাঠানো দূত।

গুমাস্তগীনের ওখানে ঘটলো ভিন্ন ঘটনা। গুমাস্তগীনের কেল্লায় যখন সুলতান আইয়ুবীর দূত পৌঁছলো তখন গুমাস্তগীন সেই দূতকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দিল। যথাসময়ে এ খবর পৌঁছলো সুলতানের কানে। সুলতান আইয়ুবী গাদ্দারদের আর অধিক বাড়াবাড়ির সুযোগ দিতে চাইলেন না। কায়রোর বাহিনীর অপেক্ষা না করে তিনি নিজের সাতশ সৈন্য, দামেশক থেকে মরহুম জঙ্গীর রেখে যাওয়া সৈন্যদের একটি বড় দল, যারা গাদ্দারদের সাথে না গিয়ে মরহুম জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর প্রেরণায় সুলতানের বাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এবং দামেশকের যুবকদের দ্বারা সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়েই আবার অভিযানে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সুলতান আইয়ুবী যখন সমরাভিযান শুরু করেন তখন নুরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী তাঁর নারী বাহিনী নিয়ে দামেশক থেকে বের হয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে যান। সেনাবাহিনীর মতই তাঁরাও ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার। সুলতান

কয়েকবারই তাদেরকে শহরে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন কিন্তু এই বিপ্লবী নারী সুলতানকে এই বলে থামিয়ে দিলেন, 'দ্বীনের মুজাহিদদের আরো কিছু পথের ধুলা আমাদের গায়ে মাখতে দাওনা ভাই!'

শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর লোকালয় ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ মরুভূমির প্রান্তে এসে পৌঁছলো কাফেলা।

বিদায়ের শেষ মুহূর্ত। সেই মহিয়সী নারীর সামনে দাঁড়ানো সুলতান আইয়ুবী। রাজিয়া খাতুন বললেন, 'যদি আমার বেটা তোমার তীর ও তলোয়ারের আওতায় এসে যায়, তবে এ কথা মনে করবে না যে, সে আমার বেটা। সে বিশ্বাসঘাতক এক গাদ্দার ছাড়া আর কেউ নয়। আর যদি তার লাশ পাও সেটা দাফন করবে না। শিয়াল ও শকুনের জন্য তা উন্মুক্ত ময়দানে ফেলে রাখবে।' মায়ের চোখ তখন খরখরে শুকনো। সেখান থেকে ঠিকরে পড়ছিল আগুনের উত্তাপ। যখন মা তাঁর সমস্ত দরদ ও ভালবাসা মাটি চাপা দিয়ে এ কথা বলছিলেন, তখন কঠিনপ্রাণ সুলতান আইয়ুবীর চোখে নেমে এসেছিল নোনা পানির ধারা।

রাজিয়া খাতুন বয়সে সুলতান আইয়ুবীর ছোটই ছিলেন। কিন্তু জঙ্গীর শিষ্য হিসাবে তিনি তাকে তুমি করেই সম্বোধন করতেন। তিনি সুলতান আইয়ুবীর দিকে হাত তুলে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করুন। যাও ভাই, তোমাকে আর দেরী করিয়ে দিতে চাই না।'

সুলতান তাঁকে সালাম জানিয়ে নেমে পড়লেন মরুভূমিতে।

যতক্ষণ তিনি তাদের দেখতে পাচ্ছিলেন ততক্ষণ রাজিয়া

খাতুন সেখানেই ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল সৈন্যদের আবছা ছায়াটুকুও।

এখান থেকেই শুরু হয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, যার বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে। খৃস্টানরা দীর্ঘদিন ধরে এ গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর জন্যই এতসব সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিল বিদ্রোহী মুসলিম আমীর ও শাসকদের। তারা চাচ্ছিল মুসলমানরা যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেরাই নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা জানতো, গৃহযুদ্ধ মুসলমানদের কেবল দুর্বলই করবে না, তাদের ঐক্য বিনষ্ট করার সাথে সাথে সমর শক্তিও শেষ করে দেবে।

এ গৃহযুদ্ধের সময়ই তারা হাসান বিন সাবাহর ফেদাইন গ্রুপকে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। আল্লাহ্ অন্যান্য বারের মত সেবারও তার প্রিয় বান্দাকে আপন মহিমায় রক্ষা করেছিলেন। এ গৃহযুদ্ধ চলেছিল কয়েক বছর। মুসলমানরা তিন চার বছর ধরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুদ্ধের প্রতিটি ময়দানেই সুলতান আইয়ুবীকে সফলতা দান করেছিলেন, যে কারণে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এমনি এক যুদ্ধের সময়। মহিয়সী রাজিয়া খাতুনের নারী বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য আর্জি পেশ করলো তাঁর কাছে। তিনি তাদের নিষেধ করেও তাদের জেদ ও যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে অবশেষে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। শত শত মেয়ে জেহাদের জযবা নিয়ে ছুটে গেল

যুদ্ধের ময়দানে। সেই যুদ্ধে এ নারী বাহিনী না থাকলে যুদ্ধে জয় লাভ করা সুলতানের জন্য কঠিন হয়ে যেতো। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সুলতান আইয়ুবী কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করে ওদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আর রাজিয়া খাতুনের কাছে পয়গাম পাঠালেন, 'ভবিষ্যতে কোন ময়দানেই যেন মেয়েদেরকে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো না হয়।'

এভাবে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে সুলতান আইয়ুবী হলব পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি হলব শহরের প্রতিরক্ষা দুর্গ এজাজ দখল করে নিলে আল মালেকুস সালেহ তার বোন শামসুন্নেসাকে দূত করে সুলতানের কাছে প্রস্তাব পাঠাল সন্ধির জন্য। শামসুন্নেসা সুলতান আইয়ুবীর কাছে এলে আবেগে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। বললেন, 'বলো, তোমার ভাই কি প্রস্তাব দিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

শামসুন্নেসা ভাইয়ের পক্ষ থেকে এজাজ দুর্গ ফেরত দেওয়ার আর্জি পেশ করে বলল, 'ভাইয়া আপনার বশ্যতা মেনে নিয়েছে।'

সুলতান আইয়ুবী আবেগ সামলে স্নেহের সুরে বললেন, 'এজাজ কেল্লা আমি আল মালেকুস সালেহকে নয়, তোমাকে দান করলাম।'

তিনি সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিয়ে এজাজ কেল্লা মেয়েটাকে দান করে দিলেন। শর্ত হলো, আল মালেকুস সালেহ তার সৈন্যের অর্ধেক সুলতানকে দিয়ে দেবে। অবশিষ্ট অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শামসুন্নেসার পক্ষ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করবে আল মালেকুস সালেহ। হলবের আমীরের দায়িত্ব তার হাতেই ন্যস্ত

থাকবে। সে হলবে শাসনকার্য পরিচালনা করবে সুলতান আইয়ুবীর বশ্যতা মেনে নিয়ে। আর যদি কখনো সুলতান আইয়ুবীর সেনা সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তখন সৈন্য দিয়ে তাকে সাহায্য করবে আল মালেকুস সালেহ। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সালেহের সৈন্য আবার তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর আল মালেকুল সালেহ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে হত্যা করে গুমাস্তগীনকে। অন্য সব আমীররা আল মালেকুস সালেহের মতই সুলতান আইয়ুবীর আনুগত্য স্বীকার করে নিলে পরিসমাপ্তি ঘটে সেই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের।

ইয়াজুদ্দিনের আহবান পেয়ে সুলতান আইয়ুবী যখন ইবনে লাউনের দিকে তাঁর বাহিনীর মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তখনই তাঁর মনে হলো হলবের সৈন্যদেরকেও এ অভিযানে শামিল রাখলে ভাল হয়। চলতি পথেই তিনি চুক্তির শর্ত মোতাবেক হলবের সৈন্য চেয়ে পাঠালেন এবং যথাসময়ে সেই বাহিনী এসে তাঁর সাথে শামিল হলো। ইবনে লাউনকে পরাজিত করার পর তিনি হলবের বাহিনীকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

এরপরই সুলতান আইয়ুবী এক বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়েন। যুদ্ধ শেষে তিনি যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন খৃস্টান রাজা বিলডন তার উপর আক্রমণ করার জন্য পাহাড়ের উপর চড়ে বসলো। বিলডন যদি পরিকল্পনা মতো সুলতানের ওপর হামলা চালাতে পারতো তবে রমলার ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা

ছিল। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম দয়ায় সময় মতোই এ খবর পেয়ে যান সুলতান। খৃস্টান গোয়েন্দা কন্যা জাভীরা সুলতানকে সতর্ক করার জন্য রাতের আঁধারে তানভীর নামক এক যুবককে পাঠিয়ে দেয় মুসলিম ক্যাম্পে। পাহাড় ডিঙিয়ে তানভীর সুলতানের কাছে এসে পৌঁছলে ঘটনার মোড় সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যান সুলতান এবং পাল্টা ফাঁদ পাতেন সম্রাট বিলডনের জন্য।

সুলতান আইয়ুবীকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে এসে অবশেষে সম্রাট বিলডন চরমভাবে পরাজিত হন। বন্দী হতে গিয়েও অল্পের জন্য বেঁচে যান রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে। কিন্তু তাঁর সৈন্যদের পরিণাম হয় খুবই ভয়াবহ।

সুলতান আইয়ুবী তখনো সেই পাহাড়ের কোলেই ক্যাম্প করে আছেন। তানভীর এরই মাঝে যোগ দিয়েছে সুলতানের বাহিনীতে। জাভীরার কোন খবর জানে না তানভীর। খৃস্টানদের ক্যাম্পে গিয়ে দেখা গেছে ক্যাম্প সম্পূর্ণ ফাঁকা। সুলতানের হাতে যারা মারা পড়েছে বা বন্দী হয়েছে তারা ছাড়া বাকীরা প্রাণ রক্ষা করেছে পালিয়ে। কিন্তু তারা পালিয়ে কোথায় গেছে জানা নেই মুসলিম বাহিনীর।

বিলডন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গোয়েন্দা মারফত জানার চেষ্টা করছিল সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর তৎপরতা। সুলতান আইয়ুবী এরপর কোন দিকে যুদ্ধাভিযান চালাবে তার কিছুই বুঝতে পারছিল না বিলডন।

এটা ১১৮১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের (৫৭৭হিঃ) ঘটনা। আল

মালেকুস সালেহের ছোট বোন শামসুন্নেছা এ সময়ই হলব থেকে দামেশকে এসেছিল তার মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে। মায়ের কাছ থেকে যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার বয়স ছিল নয়। এখন সে ষোল বছরের পূর্ণ যুবতী। আর আল মালেকুস সালেহের বয়স এখন আঠারো। কৈশোর পেরিয়ে সেও এখন পরিপূর্ণ যুবক।

শামসুন্নেসার সঙ্গে ছিল আটজন রক্ষী। দাসীকে বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিয়ে রক্ষীসহ সে গেটেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী মেয়ের সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করলেন। বাড়ির পুরনো দাসী মেয়ের পক্ষ হয়ে বলল, 'মেয়েটি বহু দূরের পথ মাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে আপনার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে কথা না বলুন, অন্ততঃ তাকে ভেতরে এসে বসতে বলুন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে না হয় সে ফিরে যাবে!'

'আমার মায়া মমতা মরে গেছে।' রাজিয়া খাতুন বললেন।

ইতিমধ্যে কামরায় এসে প্রবেশ করলো এক ষোড়শী মেয়ে। তার মুখে ও পোষাকে ধুলা লেগে আছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘ পথশ্রমে সে ক্লান্ত।

দীর্ঘক্ষণ গেটে দাঁড়িয়ে থেকে দাসীর অপেক্ষা করে অবশেষে সে নিজেই ঢুকে পড়েছে বাড়িতে।

রাজিয়া খাতুন নেকাবপরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সাথে বললেন, 'তুমি! কে তুমি?'

মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মায়ের সামনে। দাসী এক দিকে সরে গেল। রাজিয়া খাতুন ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে

গেলেন। তার বাহু দুটো নিজে থেকেই প্রসারিত হতে লাগলো। তাঁর মুখ থেকে সহসা বেরিয়ে এলো ক্ষীণ কণ্ঠ, 'তুমিই আমার কন্যা! আমার শামসুন্নেসা! আমার শামছি!'
তিনি এগুতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'তুমি! তুমি এতো বড় হয়ে গেছো!'
শামসুন্নেসা দরোজার কাছে নিরবে দাঁড়িয়ে রইলো।
রাজিয়া খাতুন তাঁর কন্যা থেকে দু'তিন কদম দূরে থাকতেই থেমে গেলেন। তার প্রসারিত হাত দুটো নেমে গেল নিচে। ঠোঁট থেকে হাসির রেখা অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর আবার দু'তিন কদম পিছিয়ে এলেন। যেনো কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন তিনি। তাঁর মুখের হাসি মলিন হয়ে সেখানে ফুটে উঠল রাগ ও গোস্বা। স্বাভাবিকভাবে যে মমতা ফুটে উঠেছিল চেহারায় সেখানেই তিনি জমা করলেন ক্ষোভ।
'তুমি এখানে কেন এসেছো?' মা চাপা অথচ রাগান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।
'মা!' শামসুন্নেসা বিমর্ষ কণ্ঠে আর্ত চিৎকার করে বাহু প্রসারিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি, মা। আমি বারো দিনের সফর তিন দিনে শেষ করেছি। আমি তীর বেগে ছুটে এসেছি আপনাকে একটু দেখতে।'
ধমকে উঠলেন মা, 'থামো, কেন এখানে এসেছো বলো?'
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়ে। মা আবার জোরালো কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার থেকে দূরেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমি

খৃস্টানদের ছায়ায় প্রতিপালিত মেয়েকে আমার কাছে আসতে দেবো না।'

'মা! তুমি আমার কথা আগে শোনো।' মেয়ে মিনতির স্বরে বললো, 'দেখো আমার শরীরে এখনো পথের ধুলাবালি জমে আছে। আমি এই ধুলাবালি নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি কিছু কথা বলার জন্য।'

'এই ধুলাবালির মলিনতার মধ্যে লেপ্টে আছে ইসলামের বীর মুজাহিদদের করুণ আর্তি। তাদের রক্তের ঘ্রাণ। আমার সন্তানের সৈন্যদের হাতে যারা শহীদ হয়েছে, জখম হয়েছে, আমার চোখে ভেসে উঠছে সেই নিবেদিতপ্রাণ মুখগুলো। গৃহযুদ্ধের বিভৎসতার কাছে তোমার এই মলিনতার কি মূল্য আছে?'

'মা!' শামসুন্নেসা দৌড়ে মায়ের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, 'মা, এই অভাগীর দিকে একটু তাকাও। আমার একমাত্র ভাই আল মালেকুস সালেহ মারা যাচ্ছে! সম্ভবত এতক্ষণে মারাই গেছে! সে মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর আপনাকে ডাকছে। ভাই-ই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। সে বলেছে, 'যা, মাকে নিয়ে আয়। আমি তার দুধের দেনা ও পাপের ক্ষমা চেয়ে মরতে চাই।'

'আমি তার দুধের দেনা ক্ষমা করে দিতে পারি।' মা বললেন, 'কিন্তু তার খুনের অপরাধকে কে ক্ষমা করবে? সে মুসলমানের সন্তান হয়ে মুসলমান ভাইদের হত্যা করিয়েছে। এক মা তার হকের অংশ ক্ষমা করে দিতে পারে কিন্তু

সন্তানের গান্দারীর ক্ষমা করার কোন অধিকার তার নেই। এটা জাতীয় অপরাধ, জাতি কি তাকে ক্ষমা করবে?'

'মা! সে তো আপনার একমাত্র পুত্র।' শামসুন্নেসা বললো, 'আপনার মহান স্বামীর একমাত্র নিদর্শন!'

'সে তার পিতার মহান গৌরব খৃস্টানদের পদতলে ঢেলে দিয়েছে।' মা বললেন।

'মা, সে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। সুলতানের বাহিনীর সাথে তার সৈন্যদের পাঠিয়ে দিয়েছে জেহাদের ময়দানে। এখন আর কোন গৃহযুদ্ধ হবে না। আইয়ুবীর বশ্যতা সে মেনে নিয়েছে।'

'তুমি কি শপথ করে বলতে পারো, তার আশেপাশে এখন আর কোন খৃস্টান সৈন্য বা উপদেষ্টা নেই? বলো, তার হেরেমে কি কোন খৃস্টান বা ইহুদী মেয়ে নেই? সে এখন আঠারো বছরের যুবক। তার ঘোড়াও বুঝতে পারে, তার পিঠের সওয়ার এক বীর পুরুষ। তুমি শুধু আমাকে এ আশ্বাসটুকু দাও, আমার ছেলের দরবার থেকে খৃস্টানদের অশুভ ভুতের ছায়া সরে গেছে। তা হলে তুমি যেমন বারো দিনের পথ তিন দিনে অতিক্রম করে ছুটে এসেছো মায়ের কাছে, আমি সে পথ দেড় দিনে অতিক্রম করে পৌঁছে যাবো ছেলের কাছে।'

'এখন আর তার কোন মেয়ের দিকে নজর করার শক্তিও নেই মা! তার জীবনের জন্য তুমি দোয়া করো।'

'আমি তার জন্য দোয়া করবো না।' মা বললেন, 'আর বদ দোয়াও দেবো না।'

তার কণ্ঠস্বর আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। তিনি দুর্বল স্বরে বললেন, 'মা কখনও সন্তানের জন্য বদ দোয়া করে না। কিন্তু মায়ের মনের ব্যথা আল্লাহ পাক ভুলে যান না। আমি হাশরের ময়দানে হাজার হাজার শহীদের মা, বিধবা স্ত্রী ও তাদের এতিম সন্তানদের সামনে লজ্জিত হতে চাই না। যে শহীদরা আমার ছেলের সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিয়েছে এই ছেলের জন্য দোয়া করে আমি তাদের সামনে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবো? আমি আমার সমস্ত মমতা ও স্নেহ সেইসব শহীদদের স্মরণেই নিবেদন করছি।'

'সে এখন তার পাপের ক্ষমা চাচ্ছে মা!' মেয়ে মায়ের পা ধরে কেঁদে কেঁদে বললো।

'এটাও আমার কাছে মনে হচ্ছে এক ধরনের ধোকা, প্রতারণা।' মা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি জানি, সুলতান আইয়ুবী যখন হলব অধিকার করেছিলেন তখন সে তোমাকেই সুলতানের কাছে পাঠিয়েছিল এজাজ দুর্গ ভিক্ষা চেয়ে। আইয়ুবী এক মহান সুলতান! তাই তিনি তোমাকে তাঁর কন্যার মত স্নেহ করে দান করেছিল এজাজ দুর্গ। তখন মালেকুস সালেহ নিজে কেন সুলতানের সামনে গেল না? সে যখন পরাজিত হলো তখন তাকেই তার অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়ে মাফ চেয়ে নেয়া উচিত ছিল। নিজে গিয়ে তার তলোয়ার আইয়ুবীর চরণে রাখা উচিত ছিল। সুলতান তার শত্রু নয়, সে তো তাঁকে শ্রদ্ধেয় মামুজান বলেই ডাকতো। সে তার ঈমান বিক্রি করেছিল বলেই ক্ষমা চাওয়ার সাহস করেনি। এমন লোক কাপুরুষ, কপট, ধোকাবাজ,

বিলাসপরায়ণ। যুগে যুগে এমন লোকই বেঈমান ও গাদ্দারদের খাতায় নাম লেখায়।'

'নিষ্ঠুর পাথর হয়ো না মা!' শামসুন্নেসা মায়ের পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললো।

'শহীদদের মায়েরাও তো তাদের প্রাণ ও মন পাথর বানিয়ে রেখেছে!' মা বললেন, 'শহীদদের মায়েরাও বলতে লজ্জা পায় যে, তার ছেলে শত্রুর আঘাতের বদলে নিজের ভাইদের আঘাতে শেষ হয়ে গেল। এ রক্তের দায়িত্ব কে বহন করবে? আমার সন্তান! আল মালেকুস সালেহ!'

'সে তো তখন খুব ছোট ছিল মা!'

'তবে আমার কাছেই থাকতো!' মা বললেন, 'যখন তার চেতনা ফিরলো তখনও তো আমার কাছে আসতে পারতো। হলব সুলতান আইয়ুবীর দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে সে এখানে চলে এলে তার এমন কি অসুবিধা হতো? তুমি চলে যাও, আর এক্ষুণি যাও। যদি সব মুসলিম মাতা আমার মতই সাবধান ও আবেগশূন্য হয়ে উঠতে পারে তবে কারোর বেটাই আর শহীদ হবে না। সবাই হবে গাজী, সবাই হবে বিজয়ী বীর। আমি দয়া, মায়াকে হত্যা করেছি। আমার মমতা শহীদ হয়ে গেছে।'

'মা, কখনও কি কেউ তার মেয়েকে এমনভাবে বিদায় করে?'

'তবে আমার কাছেই থেকে যাও।' মা বললেন, 'কিন্তু এই শর্তে যে, তোমার ভাইয়ের নাম কখনও মুখে আনবে না।'

'মা! এটা তো সম্ভব নয়!' মেয়ে বললো, 'যে ভাই আমাকে লালন পালন করে বড় করেছে তার নাম কি আমি না নিয়ে

পারবো?'
'তবে তার কাছেই চলে যাও।' মা বললেন, 'তুমিও খৃস্টানদের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছো, চিন্তা-চেতনায় তুমি তোমার ভাইয়ের থেকে আর কত উন্নত হবে! এখানকার মেয়েদের দেখো, তারা ইসলামের নামে জীবন কুরবানী করতে প্রস্তুত। আমি যখন ওদেরকে ট্রেনিং দেই এবং ওদের শাসন করি তখন ওরা ভয়ে কাঁপে। তুমি যদি এখানে থাকো তবে ওরা বলবে, আপনি এবার আপনার নিজের মেয়ের খবর নেন। তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে, আমার ছেলে খৃস্টানদের সাথে উঠা বসা করে না, মদ খায় না এবং তার পাশে কোন খৃস্টান বা ইহুদী মেয়ে থাকে না?'
শামসুন্নেসার মাথা নত হয়ে গেল। সে মায়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারল না, চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।
মা বললেন, 'নাও, বসো। যাওয়ার আগে মায়ের দেয়া আহারটুকু খেয়ে নাও। তারপর চলে যাও।'
শামসুন্নেসা মাথা নিচু করে এক তক্তপোষে বসে পড়ল। বাড়ির পুরনো চাকরানী তার সামনে কিছু নাস্তা-পানি দিল। মা বললেন, 'যদি ফিরে গিয়ে দেখো আমার সন্তান বেঁচে আছে তবে তাকে বলবে, তোমার মা তোমার দুধের ঋণ মাফ দিয়েছে। কিন্তু তোমাদের হাতে শহীদ হওয়া শহীদদের খুনের ক্ষমা করেনি। তাকে আরও বলবে, যদি তোমার বুকে খৃস্টানদের তীর বিদ্ধ হতো আর তীরবিদ্ধ অবস্থায় ইসলামের পতাকা তলে এসে তুমি মারা যেতে তবে তোমার মা উড়ে গিয়ে তোমার লাশ বুকে তুলে নিয়ে দামেশকে নিয়ে

আসতো। আর গর্ব ভরে সেই লাশ শহরের অলিগলিতে ঘুরিয়ে বলতো, দেখো, দেখো! আমার ছেলে ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছে। সেই লাশ শহরের কবরস্থানে দাফন করে সবাইকে বলে বেড়াতো, দেখো! এইখানে আমার বেটার কবর। আমার বেটা ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছিল। কিন্তু এখন আমি কি বলবো?'

শামসুন্নেসা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসেছিল। মায়ের কথা যত শুনছিল ততই তার মাথা আরো নত হচ্ছিল। মায়ের কথা শেষ হলে সে মুখ তুলে চাইল মায়ের দিকে। দেখা গেল তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। সে অশ্রু তার গাল বেয়ে নেমে ভিজিয়ে দিচ্ছে গায়ের বসন। সে হাটু গেড়ে বসে মায়ের আচল ধরে চুমা দিল। তারপর সেই আচল তার চোখে মুখে লাগালো এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'যাই মা। আমার ভাই আমার ছোট বেলার সাথী। এক সাথে এতদিন কাটিয়েছি। তার মরার সময় আমার কিছু দায়িত্ব কর্তব্য থেকেই যায়। আমি তার কাছেই যাচ্ছি। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, সে আর বাঁচবে না। আমি তার দাফন কাফন সেরে আবার আপনার খেদমতে এসে হাজির হবো।'

'আবার কি জন্য আসবে?' মা তিরষ্কারের কণ্ঠে বললেন।

মেয়ে এ তিরষ্কারে বিচলিত না হয়ে চোখের পানি মুছে বললো, 'সেই সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে।' মেয়ে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার ছেলের পরিবর্তে আমি আপনাকে এমন এক ছেলে দান করবো, যে শহীদ হলে আপনি বৃদ্ধা বয়সে তার কবরের

সামনে বসে দু'হাত তুলে দোয়া করতে পারেন। আপনি সেদিন গর্ব ভরে বলতে পারবেন, দেখো, দেখো, এটা আমার শহীদ ভাইয়ের মাজার! মা! আমি আবার আসবো! আবার আসবো! আমার জন্য বর দেখে রেখো। আমি চোখ বন্ধ করেই ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। এখন আমার চোখ খুলে গেছে। সেই খোলা চোখ নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে শুধু এটুকু অনুমতি দাও মা, ভাইকে যেনো আমি নিজ হাতে কাফন পরাতে পারি। বিদায়! মা, বিদায়।'

মেয়েটি সীমাহীন শংকা ও ভয় মনে গেঁথে নিয়েই সারা পথ পাড়ি দিয়েছিল এবং ভয়-সঙ্কুচিত মন নিয়েই ধীর পদে মায়ের কাছে এসেছিল। কিন্তু এখন আর তার মনে কোন ভয় নেই। সে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বড় বড় পা ফেলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজিয়া খাতুন অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। দরজার বাইরে বেরিয়ে গেল মেয়ে। রাজিয়া খাতুন দুই বাহু বাড়িয়ে ছুটে এলেন দরজা পর্যন্ত। তার মুখ থেকে সহসাই বেরিয়ে এলো আর্তধ্বনি, 'আমার কন্যা! আমার বেটি!'

তিনি দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। গেটের বাইরে থেকে ভেসে এলো মেয়ের দরাজ কণ্ঠ, 'বিন আজর! সকল আরোহীকে এক্ষুণি ডাকো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি হলব ফিরে যেতে চাই। জলদি করো।'

মা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছেন মেয়ের তৎপরতা। বাড়ির বাইরে গেটের কাছে এসে জমা হলো আটটি ঘোড়া। সব কটাতেই একজন করে আরোহী। মেয়ে তার সামনে দাঁড়ানো এক

ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়লো। তাকে এখন শাহজাদীর মত দেখাচ্ছে। সাথে সাথে ভেসে এলো তার কমান্ড, 'চলো!'

সে তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আটটি ঘোড়া তাকে অনুসরণ করে ছুটলো তার পিছু পিছু।

রাজিয়া খাতুন দরজা বন্ধ করে দিলেন। চোখে তাঁর টলোমলো অশ্রু। তাকালেন দাসীর দিকে। মমতা মাখানো সুরে বললেন, 'ওরা না খেয়েই চলে গেল!'

মা ও মেয়ের এ সাক্ষাত ঘটেছিল ১১৮১ সালের নভেম্বর মাসে।

*

তার দু'বছর আগের ঘটনা।

সুলতান আইয়ুবী ইবনে লাউনকে পরাজিত করে তার কেল্লা তারই সৈন্যদের দিয়ে ভেঙে মিসমার করে দিয়েছেন। তারপর সেই ধ্বংসস্তুপের আবর্জনা নদীতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করেছেন তার স্মৃতি। এর পরপরই সুলতান আইয়ুবী সম্রাট বিলডনকে পরাজিত করেন। এ সফলতার মূলে ছিল জাভীরা নামের এক খৃস্টান যুবতী ও তানভীর নামের এক মুসলমান যুবক। এ যুবক যথাসময়ে পাহাড়ের উপর সম্রাট বিলডনের ওঁৎ পেতে থাকার খবর সুলতান আইয়ুবীকে পৌছে দেয়ার সুবাদেই সুলতান দ্বিতীয়বারের মত বিলডনকে পরাজিত করেন। এর আগে তিনি সুলতান আইয়ুবীর ভাই তকিউদ্দিনের হাতেও চরম মার খেয়েছিলেন।

এবার সুলতান আইয়ুবীর হাতে মার খাওয়াটা বিলডনের জন্য ছিল অপ্রত্যাশিত। এমনিতেই তকিউদ্দিনের হাতে তার অর্ধেক

বাহিনী নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই ক্ষতি পুষিয়ে উঠার আগেই সুলতানের হাতে আবার মার খেয়ে যথেষ্ট কাবু হয়ে গেলেন বিলডন। কিন্তু তিনি তো আর একাই খৃস্টান সম্রাট নন। অন্যান্য রাষ্ট্রে যারা খৃস্টান সম্রাট আছেন তারাও প্রত্যেকেই ইসলামের ব্যাপারে সমান মারমুখী। মুসলমানদের সাথে কোন একক খৃস্টান সম্রাট বা রাষ্ট্রের সংঘাত নয় বরং সংঘাত চলছিল খৃস্টবাদের সাথে ইসলামের। আর তাতে জড়িয়ে পড়েছিল সকল খৃস্ট সম্রাট এবং ইসলামী শক্তি। এই সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ইসলামের সংঘাতের নামই ছিল ক্রুসেড। এ ক্রুসেড বাহিনী ছড়িয়েছিল বিস্তৃত আরব বিশ্বসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।

যদিও তাদের প্রত্যেকেই অন্যকে টেক্কা দিয়ে ক্ষমতা ও শক্তির দিক থেকে শীর্ষে পৌঁছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতো কিন্তু ইসলামের সামনে সবাই এককাট্টা হয়ে যেতো। এ সুবিধাটুকুই নিতে চেয়েছিলেন সম্রাট বিলডন। তার সৈন্য, অস্ত্রবল এবং অর্থ সবই ছিল প্রচুর। আইয়ুবীকে পরাজিত করতে পারলে তিনিই হতেন খৃস্টান জগতের হিরো। এ আশা নিয়েই তিনি ইসলামী শক্তির মুখোমুখী হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, উন্নত অস্ত্র আর ঘোড়া তাকে বিজয় দিতে পারেনি। পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে হলো তাকে।

এরপর কিছুকাল তার কেটে গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে। কিন্তু সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করেও নতুন করে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সাহস তার

হলো না। কারণ সুলতান আইয়ুবী ইবনে লাউনকে পরাজিত করায় এমনিতেই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইবনে লাউন আর্মেনিয়ান লোক হলেও খৃস্টানদের সে ছিল বন্ধু। তার পরাজয়ে বিলডন মনে দারুণ আঘাত পেয়েছিল। তা ছাড়া যখন জানতে পারলো, ইবনে লাউনের কেল্লায় আক্রমণের সময় সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যের সাথে ছিল আল মালেকুস সালেহের সৈন্য, তখন তা তাকে আরো ভাবিয়ে তুললো।

যদিও বিলডন এবং অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটরা জানতো, সুলতান আইয়ুবী আল মালেকুস সালেহকে পরাজিত করে শর্তসাপেক্ষে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তারা ভাল মতই জানতো, আল মালেকুস সালেহ চুক্তি মানার লোক নন। নেহায়েত বিপদে পড়েই তিনি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। আল মালেকুস সালেহ মূলতঃ তাদেরই লোক। কিন্তু আইয়ুবীর বাহিনীর সাথে সৈন্য প্রেরণ প্রমাণ করে, সে এখন আর খৃস্টানদের বন্ধু নেই। হয়তো তার মধ্যে সত্যি আইয়ুবীর প্রভাব পড়েছে।

বিলডন ভেবেছিলেন, আল মালেকুস সালেহ প্রকাশ্যে সুলতান আইয়ুবীর ভক্ত ও তাবেদার সাজলেও ভেতরে ভেতরে খৃস্টানদের বন্ধুই রয়ে গেছে। কিন্তু আইয়ুবীর বাহিনীকে আল মালেকুস সালেহ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছে জানতে পেরে বিলডন ভীত হয়ে ওই অঞ্চল ছেড়ে সোজা জেরুজালেমের পথ ধরলেন। আক্রাতে ক্রুসেড বাহিনীর বিশাল ঘাঁটি থাকলেও জেরুজালেমই ছিল ক্রুসেড বাহিনীর

হেডকোয়ার্টার। তিনি আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ রেখে সেই হেডকোয়ার্টারে গিয়ে উঠতে চাইলেন।

'আপনারা কি জানেন, সুলতান আইয়ুবী আবার মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে?' জেরুজালেমে বিলডন খৃস্টান সম্রাট ও জেনারেলদের মিটিংয়ে বললেন, 'আল মালেকুল সালেহকে আপনারা নিজেদের দলের লোক বলে মনে করেন। কিন্তু আপনারা কি জানেন, সে তার সৈন্য বাহিনী সুলতান আইয়ুবীর হাতে তুলে দিয়েছে?'

'ইবনে লাউনের পরাজয় আমাদের নিজেদের পরাজয়।' ফিলিপ আগাস্টাস বললেন, 'যদি আপনি ওঁৎ পেতে থাকার চেয়ে ইবনে লাউনের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন, আর সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পিছন থেকে আক্রমণ করতেন তবে পরাজয় তাঁরই হতো।'

'এখানে বসে বসে সমালোচনা করা যত সোজা, সুলতান আইয়ুবীর সাথে লড়াই করা তত সহজ নয়। কায়রো থেকে বেরোনোর পরপরই আমরা জেনেছিলাম সুলতান আইয়ুবীর সমর অভিযান কোন দিকে। কিন্তু তিনি যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে ইবনে লাউনের দিকে যাত্রা করার খবর পেলেও তিনি যে ইবনে লাউনকেই আক্রমণ করে বসবেন তা আমি বুঝতে পারিনি।'

'এই বুঝতে না পারার দায়িত্বটা আপনি কার ওপর চাপাবেন?' গে অব লুজিনা বললেন, 'আমরা তার কাছ থেকে বহু দূরে

ছিলাম। তিনি কখন কোন দিকে যান, কোন গতিতে যান আমাদের চাইতে আপনারই সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত ছিল। সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী আপনার পাশ দিয়ে গিয়ে ইবনে লাউনকে আক্রমণ করলো অথচ আপনি তার কিছুই জানতে পারলেন না, এতে বাহাদুরীর কিছু নেই। এটা আপনার গোয়েন্দা বিভাগের অদক্ষতা ও দুর্বলতাই প্রমাণ করে। ওভাবে ওঁৎ পেতে বসে থেকেই বা আপনি কি পেলেন? নিশ্চিত বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে পালিয়ে এলেন এখানে, এই তো!'

'আমি জানতাম না, আমার সাথে এক মুসলমান গোয়েন্দা রয়েছে।' বিলডন বললেন, 'আমি তাকে এক অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। লোকটি আমার কয়েদীর চেয়ে বেশী ছিল না। কিন্তু যথাসময়ে সে পালিয়ে গিয়ে সুলতান আইয়ুবীকে সতর্ক করেছিল বলেই যুদ্ধের মোড় এভাবে পাল্টে গিয়েছিল। নইলে আমার ওঁৎ পেতে থাকার খবর তার জানার কথা ছিল না। যাক সে কথা, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি! তারচে বলো আইয়ুবী এবং আস সালেহের চুক্তির মধ্যে কেমন করে ফাটল ধরানো যায়।'

'আপনি কি মুসলমানদের দুর্বলতা ভুলে গেছেন? নাকি উপেক্ষা করছেন?' অন্য এক খৃস্টান সম্রাট বললেন, 'যখন আমরা আস সালেহ, তার আমীর ও উজিরদের উপঢৌকন দিয়ে হাত করেছিলাম তখন আল মালেকুস্ সালেহ ছিল খুব ছোট, অবুঝ কিশোর। এখন সে পূর্ণ যৌবনে পা দিয়েছে। নব যৌবনে পদার্পনকারী একজন সামর্থবান পুরুষকে ঘায়েল করা

কি খুবই কঠিন? আমার তো মনে হয় এখন তাকে হাতের মুঠোয় নেয়া আরও সহজ। যৌবনকে ঘায়েল করার উৎকৃষ্ট অস্ত্র ব্যবহার করুন। বিশেষ দূত মারফত লোভনীয় পুরষ্কার ও উপহার সামগ্রী পাঠান। এ পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে তাকে আমাদের বন্ধু বানানোর চিন্তা বাদ দিন। এখনকার আসল কাজ গোপনেই সারতে হবে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' বললেন আরেক সম্রাট, 'তাকে এখন আর সামরিক জোটে আনা ঠিক হবে না। এমনটি কল্পনা করাও অন্যায় হবে। সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী ময়দানে অপেক্ষা করছে। তার ভাই তকিউদ্দিনও সসৈন্যে ময়দানে অবস্থান নিয়েছে। ওদিকে আস সালেহের কাছে তার নিজের বাহিনী ছাড়াও হারান এবং মুশেলের সৈন্য রয়েছে বলে আমাদের উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। সে যদি আমাদের পক্ষ নিতে যায় সুলতান আইয়ুবী সাথে সাথে হলব আক্রমণ করে তার সমস্ত সৈন্য নিজ কমান্ডে নিয়ে নেবেন।

তারচে বড় যে ক্ষতি হবে তা হচ্ছে, একবার আল মালেকুস সালেহ বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হলে দ্বিতীয়বার সে সুলতানের অনুকম্পা আশা করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আল মালেকুস সালেহকে চিরদিনের মত হারাতে হবে আমাদের। আর এ ক্ষতি অপূরণীয় ক্ষতি।'

'কিন্তু যদি আমরা সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আইয়ুবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি? আপনারাই তো বললেন, আল মালেকুস সালেহ বিপদে পড়ে আইয়ুবীর পক্ষ নিয়েছে। আমরা বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলে সে কি আমাদের পক্ষ নেবে

না?'

'আপনার মাথা বিগড়ে গেছে। এমন সন্দেহ নিয়ে যুদ্ধ হয় না। আমাদের এখন বড় কাজ ফিলিস্তিনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা। আইয়ুবী আঘাত হানলেও যেনো ফিলিস্তিন আমরা ধরে রাখতে পারি সেটাই হবে এখনকার মূল পরিকল্পনা। ফিলিস্তিন অরক্ষিত রেখে আমরা কোথাও যেতে পারি না।'

'সবার যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদেরকে আমার সাহায্যে দিলে ওদের নিয়েই আমি আরেকবার আইয়ুবীর মুখোমুখী হতে চাই। বিপদের ঝুঁকি আমার অথচ শত্রু মরবে সকলের। আপনারা আমার এ প্রস্তাব গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখুন।'

'আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদেরকে আমরা এমনিতেই ওসব জায়গায় বসিয়ে রাখিনি। সুলতান আইয়ুবী কখন কোন দিকে রোখ করে, তার সংকল্প ও টার্গেট কি বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্যই আমরা বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি। এমতাবস্থায় এখন আমরা আপনাকে কোনই সাহায্য করতে পারবো না। আপনি কৌশলে আস সালেহকে মুঠোর মধ্যে রাখতে চেষ্টা করুন, তাতেই আপনার লাভ হবে।'

১১৮০ খৃস্টাব্দে মুসেলের আমীর সাইফুদ্দিন গাজী মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে মুসেলের আমীর পদে অধিষ্ঠিত হন ইয়াজউদ্দিন মাসুদ। ঠিক একই সময়ে সুলতান আইয়ুবীর ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে ইন্তেকাল করেন। এ খবর পেয়ে সুলতান আইয়ুবী অভিযান মুলতবী রেখে মিশর ফিরে যাওয়া জরুরী মনে করলেন। তিনি তাঁর বাহিনী তাঁর ভাই তকিউদ্দিনের কমাণ্ডে রেখে মিশর রওনা হয়ে গেলেন। ফলে সুলতানের সমস্ত পরিকল্পনা আবার উলটপালট হয়ে গেল।

জেরুজালেম থেকে সম্রাট বিলডন কোন সাহায্য না পাওয়ায় এবং সুলতান আইয়ুবী মিশর ফিরে গেছেন জানতে পেরে তিনিও নিজ সাম্রাজ্যে ফিরে গেলেন। এরপর তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার সেনা ঘাটতি পূরণে। তিনি নতুন ভর্তি সৈন্যদের উপযুক্ত ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। সৈন্যদেরকে যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তোলার সাথে সাথে তারা যেন সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের মোকাবেলা করতে পারে সে জন্য তিনি তার সৈন্যদেরকে সুলতান আইয়ুবীর রণকৌশল শিক্ষা দিতে লাগলেন।

একদিকে চলছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি অন্যদিকে কুটনৈতিক তৎপরতা। কুটনৈতিক তৎপরতা বলতে আল মালেকুস সালেহের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং তাকে হাতের মুঠোয় রাখার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

আস সালেহ এখন শিশু নয় পরিপূর্ণ যুবক। রাজ্য শাসনের আইন কানুন এখন তিনি ভালই বুঝেন। বুঝেন পারিপার্শ্বিকতা

এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বপরিস্থিতি। খৃষ্টানদের সাথে দহরম মহরম যে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর, এ কথাও যে বুঝেন না এমন নয়। খৃষ্টানরা কেন গায়ে পড়ে তাকে সাহায্য করতে চায়, কেন তাকে নানা রকম উপঢৌকন পাঠিয়ে খুশি করতে ব্যতিব্যস্ত, এটাও তিনি ভালই বুঝতে পারেন।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর কোন খৃষ্টানকে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেয়ার কোন সুযোগ ছিল না। এমন চেষ্টাও তিনি করেননি। কিন্তু তার উপদেষ্টা এবং সেনাপতিদের অনেকেই গোপনে খৃষ্টানদের সাথে যোগসাজস অব্যাহত রাখছিল।

সুলতান আইয়ুবীর সাথে সন্ধি চুক্তি করার পর আস সালেহের দিনকাল ভালই কাটছিল। রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও তাঁর হাতেই রয়েছে। কথায় বলে সুখে থাকলে ভুতে কিলায়। তাঁর দশাও হলো তাই। তার মনের মধ্যে আবার স্বাধীন সুলতান হওয়ার স্বপ্ন ধীরে ধীরে পাখা মেলতে শুরু করলো।

একদিন তিনি সংবাদ পেলেন, খৃষ্টান সম্রাট বিলডনের এক দূত এসেছে তার সাথে দেখা করতে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে ভেতরে ডেকে নিলেন।

এ দূত ছিল খুবই ধুরন্ধর এবং বাকপটু। মানুষের মানবিক দুর্বলতা সে সহজেই আবিষ্কার করতে পারতো এবং মানুষকে পটানোর ক্ষেত্রে ছিল ওস্তাদ। সে আল মালেকুস সালেহকে জানালো, 'আমি মহামান্য সম্রাট বিলডনের পক্ষ থেকে হলবের সুযোগ্য শাসক সুলতান আল মালেকুস সালেহ-এর জন্য কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছি।'

'কি উপঢৌকন এনেছো?'
দূত তার সঙ্গে আনা একাধিক বাক্স আল মালেকুস সালেহ-এর সামনে রেখে বললো, 'এর মধ্যে আছে মহা মূল্যবান হীরা জহরত ও সোনার টুকরো। আর এতে আছে স্বর্ণখচিত দুটি তলোয়ার। এ ছাড়া আপনার জন্য মহামান্য সম্রাট পঞ্চাশটি উন্নত জাতের ঘোড়া এবং একজন সুন্দরী সেবাদাসী পাঠিয়েছেন। ওগুলো বাইরে রেখে এসেছি।'
আস সালেহ বাক্স খুলে হীরা জহরত ও সোনার টুকরাগুলো দেখলেন। এরপর বাইরে গিয়ে দেখলেন ঘোড়াগুলো। কিন্তু যে উপহারের প্রতি তার দৃষ্টি গিয়ে আটকে গেল সে এক অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়ে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে প্রাণভরে দেখলেন। তার মধ্যে জন্ম নিল মানবিক দুর্বলতা। মেয়েটি যেন মুহূর্তে তাকে যাদুর মত আচ্ছন্ন করে ফেললো। বলা যায়, অতর্কিতেই সে মেয়ে তার জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর আসন গেড়ে বসলো।
দূত আস সালেহের হাতে সম্রাট বিলডনের চিঠি তুলে দিল। চিঠিটি ছিল আরবীতে লেখা। আস সালেহ চিঠির পরিবর্তে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। সে তখন ভাবছিল, এত সুন্দর মানুষও খোদার দুনিয়ায় হয়! মেয়েটি তার কল্পনার চেয়েও বেশী সুন্দরী ছিল। অনেকক্ষণ পর আস সালেহ দূতের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে চিঠির কথা?'
'জ্বি, মহামান্য সম্রাট আপনাকে একটি পত্র দিয়েছেন।'
'কোথায় সে চিঠি? কি লিখেছেন তিনি?'
'জ্বি, ওটাতো আপনার হাতে!'

এতক্ষণে সম্বিত ফিরল তাঁর। দূতের দিকে ফিরে তার দিকে চিঠিটি বাড়িয়ে ধরে বলল, 'কি লিখেছে পড়ো।'

দূত পত্রখানি খুলে পড়তে শুরু করলো। বলল, 'সম্রাট বিলডন লিখেছেন, হলবের শাসক, প্রিয় আল মালেকুস সালেহ। আমি দূতের মাধ্যমে সামান্য উপঢৌকন পাঠালাম। আশা করি গ্রহণ করে আমার বন্ধুত্ব কবুল করে নেবেন। সুলতান আইয়ুবীর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার পর আমি হলবে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার প্রয়োজন বোধ করি না। আপনি আমার বন্ধু ও সন্তানের মত। যখন আপনি শিশু ছিলেন তখনো আমি আপনাকে সাহায্য করেছিলাম। আমি জানি বাধ্য হয়েই আপনি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বশ্যতা কবুল করে নিয়েছেন। আমি বলবো, এটা আপনি ঠিকই করেছেন। এতে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতাই প্রমাণিত হয়েছে। একজন বিচক্ষণ শাসকের মতই যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আপনি। আমার দুঃখ হয় গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিনের জন্য। তারা আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। তারা এত ধূর্ততার সাথে প্রতারণা করেছিল যে, আমি নিজেও তা বুঝতে পারিনি। সেদিন যদি আপনি একা থাকতেন তবে আপনার সৈন্যদের পরাজয় স্বীকার করতে হতো না। গুমাস্তগীন কেমন ধরনের ধোকাবাজ আপনি সময় মত তা বুঝে ফেলেছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত আপনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে আপনি যে বিজ্ঞতার প্রমাণ দিলেন তা ইতিহাসে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

আপনি সেদিন যথার্থই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। আপনি তাকে হত্যা না করলে সেই আপনাকে খুন করে বসতো। সাইফুদ্দিনও আপনাকে বার বার ধোকা দিয়েছে। সে হলবের উপর আধিপত্য বিস্তার করার মানসেই আপনার সাথে হাত মিলিয়েছিল। আমি তা টের পেয়েই তাকে সাবধান করলাম এবং এমন সংকল্প থেকে দূরে থাকতে বললাম তাকে।
আপনি শেষে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে পরাজিত হলেন। যে কারণে আপনি তার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আপনি এতটাই নিরূপায় ছিলেন যে, আপনি ইবনে লাউনের উপর আক্রমণ করার জন্য তাকে সৈন্য দিতে পর্যন্ত বাধ্য হলেন।
আমি ভাল করেই জানি, আপনার মত চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ যোদ্ধা এমন অপমান সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আপনি ছিলেন একা এবং নিরূপায়। আমিও সর্বদা যুদ্ধে জড়িয়ে থাকার ফলে আপনাকে সাহায্যে করতে পারিনি।
এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আইয়ুবী মিশর ফিরে যাওয়ায় আমি নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ পেয়েছি। এখন আমি আপনাকে সবরকম সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার মত অবস্থানে ফিরে এসেছি।
আপনি এমন চিন্তা করবেন না যে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আপনাকে বিনা স্বার্থে স্বায়ত্বশাসন দিয়ে রেখেছেন। এ স্বায়ত্বশাসনের অর্থ আসলে পরাধীনতা। তিনি ধীরে ধীরে আপনাকে গোলামে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। আপনাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তার উন্নতির সিঁড়ি হিসাবে। তিনি

ইয়াজুদ্দিনকে সাহায্য করতে গিয়ে আর্মেনীয়দের পরাজিত করেছেন। এক লড়াই দিয়ে দু'জনকেই তিনি তাঁর করুণা পাশে আবদ্ধ করে নিয়েছেন। এভাবে সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যের শাসকদের আনুগত্য তিনি আগেই আদায় করে নিয়েছেন এবং এখনো নিচ্ছেন। এখন তাঁর দৃষ্টি হলব, হারান ও মুশেলের দিকে।

একটু চিন্তা করুণ, তিনি আমাদের ওপর বার বার এই বলে আঘাত হানছেন, আমরা তার ধর্মের শত্রু। অথচ তিনি যে আল্লাহর এবাদত করেন আমরাও সেই আল্লাহরই উপাসনা করি। আপনিই বলুন, এটা কি জিহাদ না পররাজ্য গ্রাসের উদগ্র লালসা? তারপর ইবনে লাউনের কথা ধরুন। সে তো আর খৃস্টান নয়, তাহলে তার ওপর এ আক্রমণ কেন? আজ ইবনে লাউনের সাথে যুদ্ধ করার নাম করে আপনার আংশিক সৈন্য নিয়েছেন, কাল আমাদের সাথে লড়াই বাঁধলে আপনার সব সৈন্য তিনি চেয়ে বসবেন না এর নিশ্চয়তা কি? এভাবেই আপনার সমস্ত প্রতিরক্ষা শক্তি তিনি একদিন নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তারপর কেড়ে নেবেন আপনার গদি।

তিনি ইবনে লাউনকে পরাজিত করে আবার মিশরে চলে গেছেন। তার এ চলে যাওয়ার উদ্দেশ্য আমরা গোয়েন্দা মারফত জানতে পেরেছি। তিনি ইবনে লাউনের কাছ থেকে অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে মিশরে ফিরে গেছেন। সেই সম্পদ তিনি তার নিজস্ব খাজানায় রেখে আবার ফিরে আসবেন নতুন করে লুটপাটের আশায়। তিনি আপনাকে কি দিয়েছেন? আপনার সৈন্যদেরকে গনিমতের মালের কত অংশ দিয়েছে? তিনি বার

বার জেরুজালেম উদ্ধারের কথা বলেন। কিন্তু তিনি জেরুজালেমের দিকে অভিযান না চালিয়ে কেন ইবনে লাউনের দিকে চালালেন? আপনাকে কি কেউ বলেছে, আর্মেনীয়দের কতটি মেয়ে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন?

এ সব প্রশ্নগুলো আপনি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উদ্দেশ্য কি তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন এ ধুরন্ধর ব্যক্তির নিয়ত ও টার্গেট কি? আপনার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা পরস্পর শান্তিতে বসবাস করতে চাই। কিন্তু আইয়ুবী বার বার আমাদের ওপর আঘাত করে আমাদের ঘুম হারাম করে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি কেবল আমাদেরই ক্ষমতাচ্যুত করতে চান না, আমাদের দুর্বল করতে পারলে তিনি কাউকেই রেহাই দেবেন না। রাজ্যলুলোপ এ ব্যক্তির থাবা থেকে আমি বা আপনি আমরা কেউ রেহাই পাবো না। আপাততঃ তিনি আপনাকেও অন্যান্য আমীরদের মত তার থলির বিড়াল বানিয়ে আমাদের সাথে আপনার বন্ধুত্ব খতম করে দিতে চান। আমার লাভের জন্য নয়, রবং আপনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বলছি, যদি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চান তবে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার ব্যবস্থা করুন। নইলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আপনার কোন অস্তিত্বই রাখবেন না তিনি। আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিয়েছি। আমাদের দিক থেকে নিরাশ হয়ে গেলে তার পরবর্তী টার্গেট হবেন আপনারা।

যদি আপনি আমার কথা বুঝতে পেরে থাকেন তবে উত্তর দেবেন। যদি আপনি চান তবে আমি আমার উপদেষ্টা পাঠাবো আপনাকে সাহায্য করার জন্য। তিনি আপনার সাথে পরামর্শ করে আপনার প্রয়োজন অনুপাতে যুদ্ধের সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে আমাকে জানাবেন। আমি উপহার হিসেবে যে ঘোড়াগুলো পাঠিয়েছি সেগুলো নমুনা স্বরূপ আপনাকে দেয়া হয়েছে। আমি আপনার বাহিনীর জন্য এমন শত শত ঘোড়া পাঠাতে পারি। ইউরোপ থেকে আমি নতুন অস্ত্র আমদানী করেছি। চাহিদা মোতাবেক সে অস্ত্রও আপনাকে দেয়া যাবে।

আরেকটি কথা! আপনি সালাহউদ্দিনের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করবেন না। চুক্তি বহাল রেখে গোপনে আপনার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিন। যে কোন বিপদে এই বন্ধুর কথা স্মরণ রাখবেন। মনে রাখবেন, আমি সব সময় আপনার সঙ্গেই আছি।'

এ চিঠি আল মালেকুস সালেহের মত ক্ষমতালোভীদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। দূত তাকে উস্কে দেয়ার জন্য শোনাল সম্রাট বিলডনের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর। নব উদ্দীপনায় টগবগ করে উঠল যুবক সালেহের প্রতিটি রক্তকণিকা। দূত তার দক্ষতা ও কৌশল একে একে প্রয়োগ করে চলল এই কল্পনাবিলাসী যুবকের ওপর।

ওদিকে নবীন যুবকের ওপর চলছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী যুবতীর বশীকরণ বাণ। আর সেই বাণে বিদ্ধ হচ্ছিল আল মালেকুস সালেহ।

আস সালেহ দূতের জন্য এমন আরাম ও আহারের ব্যবস্থা করলেন, যেন দূত নয় বিলডন নিজেই এসেছেন। তারপর নিজেকে সঁপে দিলেন সেই মেয়ের কাছে। তিনি এ মেয়ের মত লাস্যময়ী এবং পুরুষ ঘায়েল করা ছলাকলায় পারদর্শী মেয়ে জীবনে আর দেখেননি। যাদুর প্রভাবের মতই মেয়েটি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। আস সালেহ এই মেয়ের অন্ধ ভক্ত হয়ে গেলেন।

রাতে তার স্বপ্নপুরীতে মেয়েটি যখন প্রবেশ করতো, তখন তার হাতে থাকতো মদের সুরাহী ও পিয়ালা। এগুলোও উপহার হিসাবেই পেয়েছিল সে। মেয়েটি তাকে বললো, 'এই যে জীবনসুধা দেখছো এ সুধা এতই মূল্যবান যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, ছোটখাট রাজা বাদশাহরাও কোনদিন দেখেনি। খৃস্টান সম্রাটদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে এ সুধা তৈরী করা হয়। আমাকে সম্রাট বিলডন এ সুধা দিয়ে বললেন, 'বন্ধুকে বলো, আমার পক্ষ থেকে বন্ধুর জন্য এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপহার!'

'যাও! এটা শ্রেষ্ঠ উপহার হতে যাবে কেন? শ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছো তুমি!'

'আমি তো আপনার এক সামান্য দাসী মাত্র। কিন্তু আপনি আপনার এ মহলকে প্রেতপুরী বানিয়ে রেখেছেন কেন? একে স্বপ্নপুরী বানিয়ে তুলুন। রাজ মহলে তো বয়ে যাবে আনন্দের বন্যা। থাকবে শত শত দাসদাসী। সুরম্য প্রাসাদে থাকবে রাণী মহারাণী!'

'আমার হেরেমের জন্য তুমি একাই যথেষ্ট।' আল মালেকুস

সালেহ জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'তোমাকে পেয়েই আমার হেরেম ঝলমল করছে। মনে হচ্ছে সর্বত্র আলোর ফোয়ারা ছুটছে।'

'কি যে বলেন! আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার মত মেয়ে দিয়ে আপনার অন্দর মহল পূর্ণ করে দেবো।'

মেয়েটি মদের পিয়ালা তার হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'এ কথা কি সত্যি যে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর একটাই মাত্র স্ত্রী? তিনি তাঁর হেরেমে অন্য কোন নারীকে ঢুকার অনুমতি দেন না?'

'হ্যাঁ!' আস সালেহ উত্তর দিলেন, 'তুমি ঠিকই শুনেছো। তিনি মদকেও হারাম করে রেখেছেন। নিজেও পান করেন না, অন্য কাউকে পানের অনুমতিও দেন না।'

'আপনি জানেন কচু। আমার কাছ থেকে শুনুন। তাঁর হেরেমে একটি গোপন কক্ষ আছে। সেখানে অসংখ্য অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে তাঁর রক্ষিতা হিসাবে বসবাস করছে। সেখানে তিনি ছাড়া কারও প্রবেশের অনুমতি নেই। সেখানে মুসলমান মেয়ে যেমন আছে তেমনি আছে বহু ইহুদী ও খৃস্টান মেয়ে। আর মদের কথা বলছেন! সেখানে কোন সাধারণ মদ পাওয়া যায় না। সম্রাটদের জন্য যে বিশেষ সুধা তৈরী হয় তার একটি বড় চালান যথাসময়ে সেই হেরেমে পৌঁছে যায়।'

আল মালেকুস সালেহের মহল অপূর্ব সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। রংবেরংয়ের বেলুন উড়ছে প্রজাপতির মত। কামরায় খেলা করছে হালকা নীল আলোর প্রস্রবন। ফ্রান্সের শাহী

মদের মাতাল করা ঘ্রাণে মৌ মৌ করছে কামরা। তার মাঝে এক পালঙ্কে পরীর মত বসে আছে এক মেয়ে। মুগ্ধ নয়নে সেদিকে তাকিয়ে আছে এক যুবক। মনে হচ্ছে মোহগ্রস্ত।

যুবক আল মালেকুস সালেহ এগিয়ে গেলেন মেয়েটির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোনালী চুলের গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি। পাপের রাত থেকে আবার সোনালী সকাল জন্ম নিল। তখন মেয়েটিকে আস সালেহ বললো, 'এখানে আমার এক বোন আছে। তুমি কখনো তার সামনে যাবে না। আমি বিয়ে না করে কোন মেয়েকে কাছে রাখি, তা সে পছন্দ করবে না। সুযোগ মত আমি তাকে বলবো, 'তুমি মুসলমানের মেয়ে। আমার সাথে বিয়ের সম্পর্ক করতেই এসেছো।'

'আপনার বোনকে স্বাধীনভাবে কেন ছেড়ে দেন না?' মেয়েটি বললো, 'তাকে পুরুষের সাথে উঠাবসা করতে দিন! তিনি তো শাহজাদী! আর আপনি বাদশাহ। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কি আপনাদের অন্তর থেকে সব উচ্চাশা ও আভিজাত্যের অনুভূতি কেড়ে নিয়েছেন? সে মেয়ে, তাতে কি হয়েছে? তাকে যদি আমরা কোন পরগণা আলাদা করে দিয়ে তার শাসক বানিয়ে দেই তবে সেও তো এক স্বাধীন সুলতানের মতই রাজ্য শাসন করতে পারবে।'

আল মালেকুস সালেহ এ কথা শুনে আপন খেয়ালেই বাদশাহ হয়ে গেলেন। ভুলে গেলেন সুলতান আইয়ুবীর সাথে তার শর্তের কথা। ভুলে গেলেন তিনি ইসলামী হুকুমতের অধীন এক রাজ্যের সামান্য শাসক মাত্র।

'কি সংবাদ নিয়ে এসেছো দূত?' বিলডন মদের নেশায় চুর হয়ে তার দূতকে জিজ্ঞেস করলেন।
'আপনি কি মনে করেন, আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি?' দূত বললো, 'আল মালেকুস সালেহের মহলে আমি চার দিন রাজ-অতিথি ছিলাম। এই চারদিনে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমি মনে করি আপনারা বেহুদাই মুসলমানদের ওপর সৈন্য পরিচালনা করেন। আপনাদের এত জীবন ক্ষয় ও ঘোড়া নষ্ট করার কোন কারণ আমার বুঝে আসে না। যে জাতির এক শাসককে মাত্র একটি সুন্দরী দিয়ে ঘায়েল করা যায়, তাদের ওপর এত তীর-ধনুক আর অস্ত্র ব্যবহারের দরকার কি?'
'তুমি বলছো এক মেয়েতেই কেল্লা ফতেহ! সাবাস নওজোয়ান, সাবাস!'
'আমার তো মনে হয় ওদেরকে ঘায়েল করতে জ্যান্ত মেয়ে মানুষেরও দরকার নেই। ওদের সামনে শুধু মেয়েদের কিছু বেআব্রু ছবি তুলে ধরতে পারলেই তারা পাপের রাজ্যে হাবুডুবু খেতে দ্বিধা করবে না।'
'ছি! ছি! পূণ্যবান লোকদের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে নেই। তোমার তো দেখি ভদ্রতা জ্ঞানও লোপ পেয়েছে! কোথায় তোমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠালাম, এসে তার রিপোর্ট করবে, তা না, তুমি শুরু করলে হেঁয়ালী। আসল কথা বলো, তোমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলাম তার কি করে এসেছো? আমার চিঠির কি জবাব এনেছো?'

'তিনি লিখিত কোন উত্তর দেননি।' দূত বললো, 'তিনি বলেছেন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা চারপাশে ঘুরছে। এমনও হতে পারে, চিঠি ধরা পড়ে গেল, তখন কি হবে? তাই তিনি চিঠির লিখিত জবাব দেননি। তিনি আপনার সব কথা ও পরিকল্পনা মেনে নিয়েছেন। তিনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমর্থক নন বরং তার ভয়ে অনুগত, আপনার এ ধারনাই ঠিক। আইয়ুবীর মোকাবেলায় নিজেকে তিনি বড় একা ও নিঃসঙ্গ অনুভব করেন বলেই তিনি কোন রকম পদক্ষেপ নিতে সাহস করেননি। আপনার চিঠি তাকে যে সাহস ও হিম্মত জুগিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি উপদেষ্টা পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। কিন্তু তিনি আপনাকে এও বলতে বলেছেন, সেই উপদেষ্টা যেনো আরবী পোষাকে এবং বণিকের বেশে যায়। সেখানে তিনি যেন সকলকে বলেন, 'আমি অমুক মুসলিম অঞ্চল থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসেছি।' অন্যান্য উজির নাজিরদের সাথে তার যেসব কথা ও আলোচনা হবে তাতে ব্যবসায়িক আলোচনাই থাকবে প্রকাশ্যে, অন্য কিছু না। কেবল সুলতান আল মালেকুস সালেহের সাথে একান্ত আলাপের সময়ই তিনি আসল ব্যবসার কথা বলবেন।'

'বাহবা! তোফা! আমার চিঠি পড়ে তো তার মধ্যে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি?' বিলডন জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি তাকে যে ইহুদী কন্যা উপহার পাঠিয়েছেন সেই মেয়ে তার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেনি।' দূত তাঁকে বললো, 'আমি যে চারদিন সেখানে অবস্থান করেছিলাম, সে

সময়ের মধ্যে আমি তার সেনাপতিদের কয়েকজনের সাথেই আলাদা আলাদা সাক্ষাত করেছি। প্রশাসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অফিসারের সাথেও দেখা করেছি। তাদের অনেকেই সুলতান আইয়ুবীর সমর্থক। আমি তাদের মধ্য থেকে দু'জনকে বাছাই করে তাদেরকে সুলতান বানানোর প্রস্তাব দিয়েছি। সুলতান হওয়ার জন্য তারা আমাদের যে কোন ফরমায়েশ পালন করার জন্য এক পায়ে খাঁড়া। আমি তাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে কিছু আগাম পুরস্কার দিয়ে এসেছি।'

'সেখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের তৎপরতা কেমন?'

'সেখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যথেষ্ট তৎপর। আল মালেকুস সালেহের সাবধানতা অমূলক নয়। আমিও তার সাথে একমত। সেখানে কোন তৎপরতা চালাতে হলে তা খুবই গোপন চালাতে হবে।'

'কিন্তু তুমি যে গেলে ধরা পড়লে না?'

'তা তো পড়তামই! কিন্তু আমি তো সেখানে আপনার দূত হিসাবে যাইনি। সবাই জানে আমি একজন ঘোড়া ব্যবসায়ী। আল মালেকুস সালেহ চল্লিশটি ঘোড়ার অর্ডার দিয়েছিলেন, আমি সেই চালান পৌঁছে দিয়েছি।'

'আর মেয়েটিকে কি করে তার হেরেমে ঢুকালে?'

'মেয়ে কোথায়! ওতো ছিল আমার ঘোড়ার রাখালদের একজন। সেই তো ঘোড়াগুলো রাজমহলে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তাহলে তুমি কি মনে করো, আল মালেকুস সালেহ আমাদের সমর্থন করবেন?'

'আমি নিশ্চিত। তা ছাড়া মেয়েটিকে আমি ওই দুই জেনারেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, যাদের সাথে আমার আলাদা আলাদা চুক্তি ও কথা হয়েছে। তারাও আমাদের পক্ষে কাজ করবেন। আপনি আপনার লোক জলদি পাঠিয়ে দিন, বাকী কাজ উনিই সামলে নেবেন।'

এ দূত কেবল দূতই ছিল না, সে ছিল এক ঝানু গোয়েন্দা। মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক পারদর্শী। মানুষের মন ভুলানোর উস্তাদ কারিগর। সে বললো, 'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাঁর অফিসারদের উপদেশ দেয়, ক্ষমতার মোহ, ধন সম্পদের লোভ এবং নারীর লালসা মানুষকে এমন পাপের সাগরে ডুবিয়ে দেয় যে, এর যে কোন একটি দুর্বলতায় কেউ আক্রান্ত হলে তার ঈমান আমল সবই বরবাদ হয়ে যায়। এ কথা তিনি কেবল তাঁর অফিসারদের বলেন না, সমগ্র মুসলিম সমাজে এ বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি আলেম ও ইমামদেরকে সর্বদা নসিহত করেন। তার এ নসিহত মিথ্যা নয়। কিন্তু তিনি জানেন না, যখন এ তিন রোগের কোন একটি কাউকে ঘায়েল করার জন্য ছুটে যায় তখন সে ব্যক্তির আর সাধ্য থাকে না সুস্থ্য থাকার। সাধারণ মুসলমানের কথা বাদ দিন, যে মওলানা ও আলেমরা সারাদিন এ ব্যাপারে ওয়াজ করে বেড়ায়, যদি তাদের সামনেও এর কোন একটির পথ খোলাসা করে দেয়া যায়, তখন তাঁর মধ্যেও শুরু হয়ে যায় ভূমিকম্প। তার মজবুত ঈমান টলমল করতে থাকে। সামান্য সময় হয়তো তিনি দোদুল্যমানতায় ভুগতে পারেন। কিন্তু একটা সময় আসে যখন তিনিও সবার অলক্ষ্যে সেই

খোলা পথে ছুটে যান। তখন শিকল পরিয়েও তাকে ফিরিয়ে রাখা যায় না। আমার কাছে এমন নজিরও আছে, দিনভর তিনি পর্দার ওয়াজ করেন, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তিনিই হয়ে উঠেন অন্য মানুষ। তার ভাবখানা এমন, পৃথিবীর সব মানুষ তার ওয়াজ শুনে ভাল হয়ে যাক, শুধু তার জন্য একটু খোলা থাক পাপের দরোজা।'

'এ জন্যই তো সে মানুষ। নইলে ওই ব্যক্তি তো হয় ফেরেশতা হয়ে যেতো নয়তো শয়তান। মানুষের মন এমন এক জিনিস, ভাল হয়ে চলার জন্য তাকে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু খারাপ হওয়ার জন্য কোন কষ্টই করতে হয় না, শুধু একটু অসতর্ক হলেই চলে। তাহলেই জীবনভর শোনা ওয়াজ নসিহত মুহূর্তে বেকার ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।' বললেন বিলডন।

এ আলোচনার পর বিলডন বেছে বেছে তিনজন উপদেষ্টা ঠিক করলেন। তাদেরকে বেশুমার বাণিজ্যিক মাল-সামান দিয়ে বহু উটের এক কাফেলা সাজিয়ে হলবের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট সময় পরে সে কাফেলা এসে হলবে পৌঁছলো। কাফেলা আল মালেকুস সালেহের মহল থেকে কিছু দূরে এক মাঠে তাবু গাড়ল। কাফেলার সাথে সেই তিনজন ছাড়াও অনেক কর্মচারী। তারা উটের পিঠ থেকে মাল-সামান নামানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বণিক তিনজনই ছিল আরবী পোষাক পরা। তারা মহলের দিকে যাত্রা করলো।

ফটকের দারোয়ান তাদেরকে থামিয়ে দিল। তারা বলল,

'আমরা সুলতান আল মালেকুস সালেহ্-এর সাথে দেখা করতে চাই।'

'কেন?'

'আমরা অমূল্য সব হীরা মানিক ও মূল্যবান তৈজসপত্র নিয়ে এসেছি। এমন মূল্যবান জিনিস রাজা বাদশাহ ছাড়া আর কেউ কিনতে পারে না। তা ছাড়া আমরা হলবের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করতে চাই। এ নিয়েও আমরা কথাবার্তা বলবো।'

গার্ডদের কমাণ্ডার ইবনে খতিব তাদেরকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করলো। তাদের কথায় আগ্রহ দেখিয়ে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা শুরু করলো। আগন্তুক ব্যবসায়ীরা উৎসাহ সহকারে কমাণ্ডারের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য তারা কি কি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী এনেছে তার ফুলানো ফাঁপানো বর্ণনা দিতে শুরু করলো। কমাণ্ডার কথা বলার ছলে আসলে তাদের পরীক্ষা করছিল। সে খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলো, আগন্তুকদের চোখের রং সবুজ মেশানো নীল। গায়ের রং এবং চেহারাও আরবীদের মত নয়। সে ভাল করেই জানতো, বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য সরকারী নিজস্ব বিভাগ আছে, বহিরাগত ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা সেখানেই সেরে নেয়। কখনও কোন উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল এলে সরকারী কর্মকর্তারা যদি মনে করেন সুলতানের সাথে তাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ করানো দরকার, তখনই কেবল তারা বাদশাহর সাথে তাদের দেখা করার ব্যবস্থা করেন। কমাণ্ডার তাদের কথা শুনে বলল, 'আপনারা আমার সাথে আসুন।'

আগন্তুকবৃন্দকে নিয়ে কমাণ্ডার সেন্ট্রিবক্সের ভেতরে এক কামরায় গিয়ে বসল। তারপর তাদের বসতে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এবার আপনারা আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য বলুন।'

'আমরা তো আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য আপনাকে আগেই খুলে বলেছি!' এক ব্যবসায়ী বিস্মিত কণ্ঠে বলল।

'তা বলেছেন। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি, আপনারা জেরুজালেম থেকে এসেছেন, না কি আক্রা থেকে?' ইবনে খতিব জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা সওদাগর বণিক।' একজন বললো, 'আমরা প্রত্যেক দেশেই যাই। জেরুজালেমেও যাই, আক্রাতেও যাই। কিন্তু তুমি এভাবে আমাদের সাথে কথা বলছো কেন? মনে হচ্ছে তুমি আমাদের জেরা করছো?'

অন্য এক ব্যবসায়ী বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কি আমাদের সন্দেহ করছো?'

'সন্দেহ নয়!' ইবনে খতিব বললো, 'আমার বিশ্বাস, আমি আপনাদের তিনজনকে চিনি, কিন্তু আপনারা আমাকে চেনেন না। আমি আপনাদেরই লোক। এখানে আমার নাম ইবনে খতিব হলেও আমার আসল নাম অন্য কিছু। হরমন আমাকে ভালভাবেই জানেন।'

'হরমন! এ লোক আবার কে?' কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে চোখ কপালে তুলল এক ব্যবসায়ী।

ইবনে খতিব বললো, 'ও, তাইতো! হরমন কে সে কথাই তো বলা হয়নি!' এই বলে সে খৃস্টান গোয়েন্দাদের পরস্পরের

পরিচয়ের জন্য যেসব সাংকেতিক কথাবার্তা বলা হয় সে সব কথা শুরু করলো। তিন ব্যবসায়ী একে অন্যের দিকে তাকাল বিস্ময় নিয়ে। তারা ভাবতেই পারেনি আস সালেহের গেটেই তারা নিজেদের কোন বিশ্বস্ত লোককে পেয়ে যাবে। এই অভাবিত আবিষ্কারে তিনজনই প্রচণ্ড পুলক বোধ করলো এবং নিজেদের আনন্দ ধরে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠল।

তাদের আনন্দ দেখে হেসে উঠল ইবনে খতিবও।

এরা সবাই ছিল খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের অনুসন্ধানী গ্রুপের সদস্য। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে দক্ষ ও পারদর্শী। ইবনে খতিবের ইঙ্গিতধর্মী কথায় তার গোপন পরিচয় পেয়ে বণিকেরা তাদের আসল পরিচয় ফাঁস করে দিল। জানাল, তারা তিনজনই সম্রাট বিলডনের পক্ষ থেকে আল মালেকুস সালেহের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছে।

তাদেরকে আগেই বলা হয়েছিল, 'আল মালেকুস সালেহের দরবারেও আমাদের গোয়েন্দা রয়েছে। ফলে ইবনে খতিবকে তারা বিশ্বাস করলো। ইবনে খতিবও তাদের নতুন পরিচয় সঠিক বলেই ধরে নিল।

'তাহলে আপনারা এ উদ্দেশ্যেই এসেছেন?' ইবনে খতিব প্রশ্ন করলো, 'আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। কিভাবে কি করতে চান আমাকে খুলে বলুন। আমিই আপনাদের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ করে দেবো।'

'হ্যাঁ!' একজন উত্তর দিল। 'কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা শোনার আগে বলো, এখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা কেমন

আছে? তারা কি এ মহলেও আছে?'

'হ্যাঁ আছে। কিন্তু তাদের উপর আমরা কড়া দৃষ্টি রাখছি।' ইবনে খতিব বললো, 'তাদের সামনে যেনো আপনাদের না পড়তে হয় সে ব্যবস্থাও আমি করবো। এখন বলুন আপনারা কিভাবে কি করতে চান?'

সে সাংকেতিক ভাষায় আবার তাদেরকে কিছু বলল। তার এই গোপন সংকেত শুনে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যে, ইবনে খতিব সন্দেহাতীতভাবেই তাদের লোক।

তারা তার কাছে তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরল। ইবনে খতিব ভেতরে গিয়ে আল মালেকুস সালেহকে সংবাদ দিল, 'তিনজন বণিক আপনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে চান।'

'তুমি রক্ষী দলের নতুন কমাণ্ডার?' আল মালেকুস সালেহ জিজ্ঞেস করলেন।

'জী, হুজুর!' সে উত্তর দিল।

'কোথাকার বাসিন্দা?'

সে অজানা কোন এক গ্রামের নাম করলো। আল মালেকুস সালেহ তার উত্তর শুনে বললো, 'যে যখন চাইবে তখনই আমি তার সাথে দেখা করবো ভাবলে কি করে? যাও, ওদের গিয়ে বলো, হুজুর ব্যস্ত আছেন, এখন দেখা হবে না।' তারপর একটু বিরতি দিয়ে বললেন, 'কেন দেখা করতে চায় ওরা?'

'ওরা নাকি এমন সব হীরা জহরত ও মনিমানিক্য নিয়ে এসেছে, যা কেবল কোন রাজা বাদশাহর পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব।'

আল মালেকুস সালেহের তখনই মনে পড়ে গেল সম্রাট বিলডনের দূতের সাথে তার কথোপকথনের কথা। তিনি আবার ফিরলেন কমাণ্ডারের দিকে। বললেন, 'ঠিক আছে, যাও। ওদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'
সে বাইরে গিয়ে তাদের তিনজনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল আর চোখের ইশারায় বলে দিল, 'সাবধান! খুব হুশিয়ারীর সাথে কথা বলবে।'

রাতে এশার নামাজের পর ইবনে খতিব মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে বসলো। সেখানে আরও দু'জন লোক ছিল।
'এখন আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল মালেকুস সালেহ আরেকবার খৃস্টানদের জালে আবদ্ধ হতে চলেছে।' ইবনে খতিব বললো, 'আমি আপনাদের প্রথমে দূত ও তার উপঢৌকন দেয়া সম্পর্কে সংবাদ জানিয়েছি। সেগুলো যে খৃস্টানদের কাছ থেকেই এসেছিল তাও বলেছি। তাদের সাথে ছিল এক সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু দূত ফেরার সময় মেয়েটিকে সঙ্গে নেয়নি। আল মালেকুস সালেহের মগজ ধোলাই করার জন্য তাকে এখানেই রেখে গেছে। নিশ্চয়ই সে মেয়ে এখন তার মহলেই আছে।
আজ নিশ্চিত হলাম, এই দূত এসেছিল সম্রার্ট বিলডনের কাছ থেকে। বিলডন উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে আবার আল মালেকুস সালেহের ঈমান ক্রয়ের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আল মালেকুস সালেহ যে বিলডনের টোপ গিলেছে তাও এখন স্পষ্ট।'

'কিন্তু তুমি কি করে নিশ্চিত হলে যে ওই দূত বিলডনের কাছ থেকেই এসেছিল?' ইমাম সাহেব জানতে চাইলেন।
'আজ তিনজন বণিক আল মালেকুস সালেহের সাথে বাণিজ্য বিষয়ে কথা বলার জন্য এসেছে। আপনি জানেন আমি দু'বছর বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলাম খৃস্টানদের সাথে। ওখানে গোয়েন্দাগিরী করার সময়ই আমি তাদের কিছু গোপন সংকেত জানতে পারি, যার মাধ্যমে তারা একে অপরকে সনাক্ত করে। এই তিন বণিকের চেহারা, ভাষা ও কথা বলার ভঙ্গিতে আমার সন্দেহ জাগে। তারা আরবী পোষাক পরে থাকলেও সেটা যে তাদের ছদ্মবেশ বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। আমি তাদেরকে ভেতরে নিয়ে কিছু সাংকেতিক কথাবার্তা বলার পর তারা নিশ্চিত হয়ে যায়, আমি তাদেরই একজন। আল মালেকুস সালেহের দরবারে তাদের গোয়েন্দা আছে এ কথা তাদেরও জানা ছিল। আমি তাদেরকে সব রকম সাহায্য করার আশ্বাস দিলে তারা তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করে। আমি তাদেরকে আল মালেকুস সালেহের দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে তাদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করে নিয়েছি।'
'তোমার বায়তুল মুকাদ্দাসে গোয়েন্দাগিরী করার অভিজ্ঞতা এখন খুব কাজে লাগছে দেখছি।' ইমাম সাহেব বললেন, 'সম্মানিত আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণের মর্যাদা তোমরাই রাখতে পারবে।'

সুলতান আইয়ুবীর এক চৌকস গোয়েন্দা ইবনে খতিব। কিছু

দিন হলো সে হলবে এসেছে। এখানে আল মালেকুস সালেহের এক সহ-সেনাপতির চেষ্টায় তাকে গার্ড বাহিনীর কমাণ্ডার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এ সহ-সেনাপতিও সুলতান আইয়ুবীর একজন সমর্থক।

ইবনে খতিব আলী বিন সুফিয়ানের একান্ত সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। সে সময় তার কাছ থেকে এমন বিশেষ কিছু প্রশিক্ষণ সে পেয়েছিল যার জন্য সে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করতো।

এই ইবনে খতিব ছিল মেধাবী ও নির্ভীক গোয়েন্দা। সে দু'বছর এক খৃস্টান সম্রাটের দরবারে কাজ করেছে। দু'বছর ছিল খৃস্টানদের সামরিক হেড কোয়ার্টারে। সেখানে সে সময় কাটিয়েছে খৃস্টান জেনারেলদের সাথে। গোয়েন্দাগিরী করেছে সাফল্যের সঙ্গে।

জামে মসজিদের ইমামও একজন ঝানু গোয়েন্দা। তিনি হলবে সুলতান আইয়ুবীর প্রেরিত গোয়েন্দা কমাণ্ডার। কোন গোয়েন্দার রিপোর্ট দেয়ার প্রয়োজন হলে সে নামাজের সময় মসজিদে চলে আসতো। ইমামরূপী কমাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট করে ফিরে যেতো নিজের কাজে। বিশেষ করে এশার নামাজের পর ইমাম সাহেব মুসল্লীদের সাথে মত বিনিময় করতেন এবং সবার ভাল-মন্দের খোঁজ খবর নিতেন। এ সুযোগে দৈনন্দিন রিপোর্ট দেয়ার কাজটি সেরে নিত গোয়েন্দারা। কখনো কখনো বিশেষ আলাপ থাকলে তিনি খাস কামরায় ডেকে নিতেন সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দাকে। মানুষ তাঁর কাছে ছেলের পরীক্ষা, বেগমের অসুস্থতা এইসব নানা সমস্যা

বলে দোয়া চেয়ে নিত। কোন গোয়েন্দা একান্তে কথা বললেও তাই কেউ কিছু মনে করতো না।

ইবনে খতিব আজ খুব মূল্যবান রিপোর্ট এনেছে। এ নিয়েই হুজুরের খাস কামরায় বসে আলাপ করছিল গোয়েন্দারা। এ সময় এক মধ্য বয়সী মেয়েলোক হাতে এক গ্লাস পানি নিয়ে সেখানে হাজির হলো। মেয়েটি আপাদমস্তক বোরকা আবৃত। মুখে নেকাব। সে ভেতরে এসে মুখের নেকাব খানকটা সরিয়ে দিল। ইমাম সাহেব তাকে দেখে হেসে বললো, 'কি খবর নিয়ে এসেছো?'

এ মেয়ে ছিল আল মালেকুস সালেহের এক দাসী। আল মালেকুস সালেহের অন্দর মহলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল এই মহিলার ওপর। আল মালেকুস সালেহের অন্দর মহলের সকল গোপনতত্ত্বের খবর এই মহিলা নিয়মিত ইমাম সাহেবকে জানিয়ে যেতো।

যেদিন আল মালেকুস সালেহের অন্দরে সম্রাট বিলডনের পাঠানো মেয়েটি প্রবেশ করে সে দিনই সে ইমাম সাহেবকে তা রিপোর্ট করে গিয়েছিল। ইমাম সাহেব বলেছিলেন, 'নজর রাখো। আর দেখতে থাকো কি করে এই মেয়ে।'

দাসী জানাল, 'খৃস্টানদের পাঠানো মেয়েটি আল মালেকুস সালেহকে কজা করে নিয়েছে। তার চেহারা ও শরীরের গঠন, গায়ের রং, কথা বলার ভঙ্গি এবং ভাষার মাধুর্য যে কোন যুবককে ঘায়েল করার জন্য যথেষ্ট। এ মেয়ের চেহারা ও কণ্ঠে এমন যাদু আছে যার প্রভাব এড়ানো দরবেশ ব্যক্তির পক্ষেও কঠিন।' সে ইমাম সাহেবকে বলল, 'আপনি জানেন,

আস সালেহ এখনো বিয়ে করেনি। কিন্তু মেয়েটি আসার পর তার প্রতিটি রাতই হয়ে উঠছে বাসর রাত। এমন কোন রাত নেই যে রাতে মেয়েটি তাকে সঙ্গ দিচ্ছে না।'

'তার মানে মেয়েটি তাকে কব্জা করে ফেলেছে?'

'তো আর বলছি কি! এই মেয়ে আস সালেহকে তার গোলাম বানিয়ে ফেলেছে।'

'গোলাম নয় বরং বলো কয়েদী করে ফেলেছে।'

দাসী বললো, 'সে মেয়েটির জন্য এমন পাগল হয়ে গেছে যে, আমাকে আজ বললো, দেখো তো এ মেয়েটাকে তোমার পছন্দ হয় কিনা? একে আমি বিয়ে করে ফেলতে চাই, তুমি কি বলো?'

আমি তাকে বললাম, 'এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন সে কি বলে?'

আম্মার কথা শুনে উনি আৎকে উঠে বললেন, 'না না, খবরদার! ওকে এখন এসব কিছুই জানাবে না। ও জানতে পারলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে।'

'তার হেরেমে এখন কয়টি মেয়ে আছে?' জানতে চাইলেন ইমাম সাহেব।

'ছিল কয়েকজন। কিন্তু এ মেয়ে আসার পর তাদের কারোরই আর তার খাস কামরায় যাবার অনুমতি নেই। তিনি সবাইকে কঠোরভাবে তার কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করেছেন।'

'বুঝতে পারছি। তার মানে, আল মালেকুস সালেহ এখন পুরোপুরিই সে মেয়েটার জালে আটকা পড়ে গেছে।'

একজন বললো, 'এক্ষুণি সুলতান আইয়ুবীকে সব জানানো

দরকার! খৃস্টানরা আস সালেহকে দিয়ে কখন কি করিয়ে বসে তার কি ঠিক আছে!'

ইমাম সাহেব বললেন, 'এখুনি সংবাদ পাঠানোর দরকার নেই। আস সালেহ যদি চুক্তি ভঙ্গ করে বা গুরুতর কিছু করেই বসে তখন সুলতান আইয়ুবীকে জানানো হবে।'

'সুলতান আইয়ুবী ময়দান থেকে আবার মিশরে চলে গেছেন। ময়দানে আছেন তাঁর ভাই তকিউদ্দিন। তিনিও সুলতানের পরামর্শ ও আদেশ ছাড়া কিছু করবেন না।' অন্য একজন বললেন। লোকটিকে যথেষ্ট জ্ঞানী বলেই মনে হলো। তিনি বললেন, 'কিন্তু বেশী সময় নিলে এখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই এমন কিছু চিন্তা করা উচিত যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়। এ সমস্যার সমাধানে আমাদেরই উদ্যোগ নেয়া দরকার।'

'আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিতে পারি।' দাসী বললো, 'আস সালেহের ধ্যান-জ্ঞানে এখন ওই মেয়েটি ছাড়া আর কিছু নেই। নিজের ভাল-মন্দ চিন্তা করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এ মেয়ে তাঁকে দিন রাত সব সময় মদ পান করিয়ে মাতাল করে রাখে। এ হতভাগা আগেও মদ পান করতো, কিন্তু তার একটা সীমা ছিল। দিনে কখনো তিনি মদ পান করতেন না। আর এখন তিনি এত বেশী মদ পান করেন যা কল্পনাও করা যায় না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি তার বোনের সামনে উপস্থিত হন না। আগে অন্ততঃ বোনের সাথে তার দিনের বেলা দেখা সাক্ষাত হতো। কিন্তু যেদিন ওই হতভাগী মেয়েটা এসেছে সেদিন থেকে ভাই-বোনের আর

সাক্ষাতই হয় না। বোনের মধ্যে মা-বাবার আদর্শ এখনো কিছুটা টিকে আছে। ভাইয়ের ব্যাপারে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও পেরেশান। যখনই সে ব্যাকুল হয়ে ভাইয়ের ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করে, আমি বলি, 'রাজ্য শাসনের কাজে সর্বদা তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তিনি তোমার সাথে দেখা করার সুযোগই হয়তো পান না।' কিন্তু আমার এ উত্তর তাকে কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারে না। আমার পরামর্শ হলো, এই নতুন মেয়েটাকে আপনারা গায়েব করে দিন। তাতে আস সালেহের হুশ ফিরে আসতে পারে। আমি এটুকু নিশ্চয়তা আপনাদের দিতে পারি, মেয়েটা না থাকলে সে খৃস্টানদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার কথা চিন্তাও করতে পারবে না।'

এ ব্যাপারে অন্যরা মতামত দেয়ার আগেই একজন প্রস্তাব করলো, 'শুধু মেয়েটাকে নয়, বণিক তিনজনকেও গায়েব করে দেয়া উচিত।'

উপস্থিত গোয়েন্দাদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। কেউ প্রস্তাব দুটো সমর্থন করলো, কেউ এ কাজের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ার করলো অন্যদের। ব্যাপক আলোচনার পর ইবনে খতিব বললো, 'আপনারা যদি তাদের গায়েব করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে ঝুঁকি থাকার পরও এ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আস সালেহকে সতর্ক ও সাবধান করা আমাদের দায়িত্ব। তাকে সোজা পথে রাখার জন্যই আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ওদের গায়েব করে দেয়ার অভিযানটি ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু

সুলতান আইয়ুবী বা আলী বিন সুফিয়ানকে পেরেশান করার আগে এ কাজটি সমাধা করার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। অতএব প্রস্তাব দু'টো গৃহীত হলো। তবে চারজনকে এক সাথে গায়েব করে দেয়া অসম্ভব হলে আগে মেয়েটাকে ধরতে হবে। এরপর সুযোগ বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে বণিকদের ব্যাপারে।'

আল মালেকুস সালেহের দরবারে বসে তারই আশ্রিতা ও অতিথিবৃন্দকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হলো এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

১১৮১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের কোন একদিন। উটের কাফেলার পাশে বাজার বসিয়ে বেচা-কেনা করছে খৃস্টানদের পাঠানো তিন উপদেষ্টা। এখনো আগের মতই তাদের পরণে আরবী পোষাক। ইবনে খতিবের সহযোগিতায় তারা এ পোষাকেই আস সালেহের সাথে গোপনে দেখা সাক্ষাত করতো।

একাধিক বৈঠকের পর আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হলে কিভাবে আল মালেকুস সালেহ ও খৃস্টান বাহিনী পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং এই যুদ্ধের জন্য কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তার কিছু নীতিমালা ঠিক করলো ওরা। শর্তগুলো কোথাও লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হলো না ঠিকই, কিন্তু উভয় পক্ষই জানে নিজেদের প্রয়োজনেই উভয় পক্ষ এ শর্ত মেনে চলবে।

আলাপ-আলোচনা মোটামুটি শেষ। এবার বিদায়ের পালা। বিলডনের উপদেষ্টাদের অভিযান পুরোপুরি সফল। বণিক তিনজনের চেহারাতেই লেগে ছিল সেই সাফল্যের আনন্দময় দ্যুতি। খুশী আল মালেকুস সালেহও। কারণ এ শর্তের সবটাতেই তার কেবল লাভ আর লাভ। সেই লাভের অংক কষার মত সময়ও তার হাতে ছিল না। বিলডনের পাঠানো ইহুদী মেয়েটির চুলের অরণ্যে সে তখন তার সব লাভ জমা করছিল।

খুশীতে টইটম্বুর আল মালেকুস সালেহ এ উপলক্ষে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন। দাওয়াতপত্রে যদিও উপলক্ষের কারণ সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না, কিন্তু তাতে কারো কিছু যায় আসে না। শাহী খেয়ালের শাহী কারবার। যে কোন সময় যে কাউকে দাওয়াত করে তারা খাওয়াতেই পারেন!

সেই মাসের ১৭ তারিখ রাতে বড়সড় বিনোদন মাহফিলের আয়োজন করা হলো। মহলের ভেতর স্থান সংকুলান হবে না বিধায় মহলের বাইরে খোলা মাঠে বিশাল সামিয়ানা টানানো হলো। সেই সামিয়ানার ভেতর ও বাইরে চমৎকার আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হলো। প্রতিটি টেবিলের জন্য আলাদা খানসামা নিয়োগ করা হলো। তাদের হাতে খাবারসহ তুলে দেয়া হলো মদের সোরাহী ও গ্লাস।

আমন্ত্রিতরা এ দাওয়াতের কোন কারণ না জানলেও আস সালেহ এবং সেই খৃস্টান তিন উপদেষ্টা জানতো এর প্রকৃত কারণ। খৃস্টানদের সাথে গোপন ও অলিখিত চুক্তি সম্পাদনই ছিল এ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের

খবর জানতো সেনাবাহিনীর আরো দুই সেনাপতি, যাদের সাথে কথা হয়েছিল বিলডনের সেই দূতের। আর জানতো, ইবনে খতিব, ইমাম সাহেব আর আইয়ুবীর গোয়েন্দারা।

সন্ধ্যা পেরিয়ে নেমে এলো রাত। আমন্ত্রিত শত শত মেহমান সাজগোছ করে জোড়ায় জোড়ায় এসে আসন গ্রহণ শুরু করলো।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে সেই খৃস্টান তিন উপদেষ্টাও ছিল। তারা তখনও বণিকের বেশে আরবী পোষাকেই সজ্জিত ছিল। তাদের কাফেলার অন্যান্যরাও নিমন্ত্রিত ছিল। এরা অধিকাংশই ছিল খৃস্টান গোয়েন্দা। অবশিষ্টরাও ছিল খৃস্টান সৈন্য বা সেনা বাহিনীর অফিসার।

ভোজ সভায় শামিল হয়েছিল সেই ইহুদী সুন্দরী। আস সালেহের বোনও ছিল নারীদের সাথে। তারা মেহমান নয় মেজবান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিল।

শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠান। মেহমানরাও সব উচ্চপদস্থ সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসার এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ আনন্দঘন অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন কাউকে দাওয়াতই করা হয়নি। তাই অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়ার কোন গরজ কারো পক্ষ থেকেই ছিল না। এ সুযোগটাই কাজে লাগাল আইয়ুবীর গোয়েন্দারা।

মেহমানরা দল বেঁধে আসছে এবং পানাহার করছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে উপভোগ করছে নাচ-গান। ঘুরে ঘুরে একে অন্যের সাথে পরিচিত হচ্ছে। পরিচিতজনরা পরস্পর কুশল বিনিময় করছে। কারো মনেই কোন ভয় ও শংকার চিহ্ন

নেই। বিশেষ করে আস সালেহের তো ভয়ের কোন কারণই নেই। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনী ছায়ার মত তাঁর সাথে ঘুরছে।

চারদিক থেকে ভেসে আসছে রোস্ট করা দুম্বার ঘ্রাণ। মাঝে মধ্যে মদের গ্লাসের টুংটাং আওয়াজ।

বিস্তীর্ণ মাঠে মোটা তিরপল ও ছামিয়ানার নিচে আনন্দে মশগুল লোকগুলোর সময় যেন থমকে আছে। রাত বাড়ছে সামিয়ানার বাইরে কিন্তু সামিয়ানার নিচে রঙিন আলোর মাঝে রাত বাড়ার কোন প্রভাবই পড়ছে না।

রাত গভীর হলেও মেহমানদের আপ্যায়ন পুরোদমেই চলছিল। চারদিকই গমগম করছিল মেহমানদের ভীড়ে।

ইহুদী মেয়েটি রূপের গর্বে ও সফলতার আনন্দে যেন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছিল। সে এ টেবিল থেকে ছুটে যাচ্ছিল সে টেবিলে।

তখন অনেক রাত। মেহমানরা ক্লান্ত। সঙ্গীতের সুরে হৃদয় আবেশ করা আমেজ। সেই দাসী যে ইমাম সাহেবের হুজরায় গিয়েছিল পানি পড়া আনতে ইহুদী মেয়েটির কাছে এসে তাকে থামিয়ে দিয়ে এক সেনাপতির নাম করে বললো, 'সে তোমাকে ডাকছে।'

মেয়েটি জানতো এ সেনাপতি তাদেরই লোক। বললো, 'কোথায় সে?'

দাসী তাকে সামিয়ানার বাইরে এক আলো-আঁধারীর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'ওখানে।'

মেয়েটি বিলম্ব না করে সেদিকে চলে গেল। কিন্তু সেই যে

গেল আর সেদিক থেকে ফিরে এলো না।
আস সালেহ ব্যস্ততার জন্য অনেকক্ষণ খবর নিতে পারেনি ইহুদী মেয়েটির। সে জানতেই পারলো না তার প্রাণের পাখি উড়ে গেছে, গায়েব হয়ে গেছে সেই ইহুদী কন্যা।
ইবনে খতিব সারাদিন ডিউটি করেছে। রাতে উৎসবের সময় তার ডিউটি ছিল না, কিন্তু কমাণ্ডার বলে সেও উৎসবে খাওয়ার দাওয়াত পেয়েছিল।
সময় মত সেও মাহফিলে হাজির হলো। সেই তিন বণিকের সাথে কয়েকবারই তার দেখা হলো। বণিকরা যার যার মত পানাহার ও খোশগল্পে ব্যস্ত। গভীর রাতে সে এক বণিককে কাছে পেয়ে ইশারায় তাকে ডেকে সামিয়ানার বাইরে নিয়ে এলো। তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। সে বণিককে একা পেয়েই বলে উঠলো, 'আপনার অন্য সাথীরা কোথায়?'
'কেন, আছে আশেপাশেই! তোমাকে পেরেশান দেখাচ্ছে কেন?'
'আপনারা তিনজন জলদি এখান থেকে সরে পড়ুন।' ইবনে খতিব এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'নইলে মারা পড়বেন। এইমাত্র খবর পেলাম, মেহমানদের ছদ্মবেশে সুলতান আইয়ুবীর কিছু কমাণ্ডো মাহফিলে ঢুকে পড়েছে। তারা কি অঘটন ঘটাবে জানি না। এখানে আপনারা ছাড়া অন্যদের বিপদ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই। অন্যদের অবশ্য ভয়ের কোন কারণও নেই। কিন্তু তারা আপনাদের সন্দেহ করে থাকলে বিপদ আছে। এক্ষুণি আপনার অন্য দুই বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসুন। সাবধান! তাড়াহুড়ো করবেন না,

আপনারা সরে পড়ছেন, কেউ যেন টের না পায়।'
বণিক কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে গেল সামিয়ানার নিচে। সঙ্গীদের খুঁজে পেয়ে বলল, 'জলদি বাইরে চলো। জরুরী কাজ আছে।'
বণিক তার অন্য দুই সঙ্গীর কানে কানে বিপদের কথা জানালো। ওরা কোন কথা না বলে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো সামিয়ানা থেকে। ইবনে খতিব বললো, 'চলুন, আগে আপনাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে হবে। ওখানে পৌঁছে সব বিস্তারিত বলছি।'
ইবনে খতিবকে অনুসরণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এক নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের তিনজনকে লুকানোর ব্যবস্থা করে ইবনে খতিব বললো, 'আইয়ুবীর গোয়েন্দা ও কমান্ডো বাহিনী অযথা মাহফিলে আসেনি। নিশ্চয়ই তারা আপনাদের সন্দেহ করেছে। এ জায়গা নিরাপদ, কিন্তু রাজমহল আপনাদের জন্য আর নিরাপদ নয়।'
খৃস্টান বণিক বললো, 'আমাদের এখানকার কাজ শেষ। এখন এখানে ঝুঁকি নিয়ে অবস্থানের কোন মানে হয় না। তারচে এ মুহূর্তে আমরা হলব থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'
'আমাদের এখান থেকে বের হতেই হবে এবং এক্ষুণি।' বলল অন্যজন।
'তবে জলদি করুন।' ইবনে খতিব বললো, 'আপনারা রওনা হয়ে যান। কাল আমি কাফেলাকে আপনাদের চলে যাওয়ার খবর পৌঁছে দেবো। দেরী করবেন না, দেরী করলে এখান থেকে সকালে আপনাদের লাশ বের করতে হবে।'

ইবনে খতিব কামরা থেকে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরই চারটি ঘোড়া নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। কাউকে কিছু না বলে প্রথমেই সে নিজে ঘোড়ায় চেপে বসলো। তার দেখাদেখি বণিক তিনজনও চড়ে বসলো ঘোড়ায়। চার আরোহী হালকা চালে হলবের রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

ভোজ অনুষ্ঠানে তখনো চলছে নাচ, গান। মদ খেয়ে বাজনার তালে তালে দুলছে মেহমানরা। তাদের অলক্ষ্যে চারটি ঘোড়া শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল সামনে।

আল মালেকুস সালেহ এবং তার ষড়যন্ত্রের দোসর তিন খৃস্টান গোয়েন্দা জানতেও পারল না, নকল ভীতি থেকে পালিয়ে তারা ছুটছে মরণ পথের দিকে।

লোকালয় থেকে দূরে এক বাড়ীতে নিয়ে ওদের তুলল ইবনে খতিব। বলল, 'আপনাদের পোষাক পাল্টাতে হবে। বণিকের বেশ ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের বেশ ধরতে হবে আপনাদের। আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যখন টের পাবে আপনারা মাহফিলে নেই, কেটে পড়েছেন, তখন চারদিকে তারা ছড়িয়ে পড়বে আপনাদের খোঁজে। সকাল হওয়ার আগেই আপনারা ওদের হাতে পড়েন তা আমি চাই না।'

তিন খৃস্টান বণিক ইবনে খতিবের প্রশংসা করে বলল, 'প্রভু বড় মঙ্গলময়, নইলে তোমাকে এভাবে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দেবেন কেন?' তারা সেখানে বসে পড়ে শহর থেকে বেরোতে পারায় আল্লাহর শুকুর গোজারী শুরু করল।

ইবনে খতিব তাদের শান্তনা দিয়ে বলল, 'ভয় নেই। এখন আপনারা নিরাপদ। বিশ্রাম নিন। সকাল বেলা কোন

কাফেলার সাথে আপনাদের শামিল করে দেবো। শুধু আপনারা তিনজন এক কাফেলায় থাকলে সন্দেহের তালিকায় পড়ে যাবেন। তারচে যে কাফেলায় নারী ও শিশু আছে তেমন কোন কাফেলার সাথে আপনাদের শামিল করে দিলে ওরা আর কিছুতেই আপনাদের সনাক্ত করতে পারবে না।'

'সত্যিই তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।' এক বণিক বললো, 'তোমার মত হুশিয়ার গোয়েন্দা আস সালেহের বাড়ীতে ঠাঁই করে নিতে পেরেছো, এটা খুবই আশার কথা। পরিকল্পনা মত সব কাজ এগুচ্ছে কিনা এদিকে নজর রেখো।'

'কিন্তু আপনাদের পরিকল্পনা কি তাইতো জানি না!' ইবনে খতিব জিজ্ঞেস করলো, 'সুলতানের সাথে আপনাদের কি কথা হলো? ওনার সাথে কি আপনাদের কোন চুক্তি হয়েছে?'

'লিখিত চুক্তি করা আমরা ঠিক মনে করিনি। চুক্তি যা হয়েছে সবই মৌখিক। ইচ্ছে করেই লিখিত চুক্তির ঝুঁকি নিলাম না।'

'আপনারা ঠিকই করেছেন। চুক্তির শর্তগুলো উভয় পক্ষের জানা থাকলেই হলো। তা সুলতানের সাথে কি কি চুক্তি হলো?'

'বলছি। মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখো। সুলতান এসব শর্ত ঠিক ঠিক পালন করছে কিনা তা তো তোমাকেই নজর রাখতে হবে।'

'ও নিয়ে আপনারা ভাববেন না। আমার চোখ কান সব সময় খোলাই থাকে।'

বিলডনের উপদেষ্টা বললো, 'আস সালেহকে আমরা গোপনে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও ঘোড়া সরবরাহ করবো। আমাদের

অফিসাররা এখানে এসে তাঁর সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং দিয়ে যাবে। তাকে আমরা গোয়েন্দা সাপোর্ট দিয়ে যাবো। যখন সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হবে তখন আমাদের মধ্য থেকে যে আক্রান্ত হবে সে লড়বে সম্মুখ দিক থেকে আর অন্য পক্ষ পেছন থেকে সুলতান আইয়ুবীকে আক্রমণ করবে। সংক্ষেপ কথা হলো, আস সালেহ সুলতান আইয়ুবীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করবে, কিন্তু চুক্তি তখন ভঙ্গ করবে যখন আমরা তাঁকে ইঙ্গিত দেবো।'

'এখন আমাদের সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নেয়া উচিত।' এক খৃস্টান বললো।

'হ্যাঁ।' ইবনে খতিব বললো, 'আসুন আমার সাথে। পাশের কামরায় সামান্য ঘুমিয়ে নিন।'

ইবনে খতিব পাশের কামরার দরজা খুললো। ঘরটা অন্ধকার। সে তিন জনকেই বললো, 'আসুন, এ ঘরেই আপনারা আরামে ঘুমাতে পারবেন।'

অন্ধকারেই ভেতরে পা রাখল ইবনে খতিব। তিনজনই তার পিছন পিছন সে কামরায় গিয়ে ঢুকল। অকস্মাৎ তারা অনুভব করলো, কেউ তাদের গলা পেঁচিয়ে ধরছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। যখন বুঝতে পারল তারা আক্রান্ত ততক্ষণে তাদের গলা ও বাহুতে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে কারো পুরুষ্ট আঙুল। তারা এ আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার কোন সুযোগই পেল না, তার আগেই প্রত্যেকের বুকে আমূল ঢুকে গেছে ইস্পাতের ধারালো খঞ্জর।

কামরার এক কোণে আগেই এক গর্ত করা ছিল। তিনজনের লাশই তার মধ্যে ফেলে দেয়া হলো।

সেই কামরারই এক কোণে ইহুদী মেয়েটি বসেছিল। অন্ধকারের জন্য ওকে খৃস্টানরা দেখতে পায়নি। তার হাত-পা ছিল বাঁধা। মুখের ভেতর গোঁজা ছিল কাপড়। তাকেও সেই অনুষ্ঠান থেকে ডেকে এনে এখানে তুলেছে আইয়ুবীর গোয়েন্দারা।

কামরায় এখন খতিব ছাড়া আরও পাঁচজন লোক। তারা মেয়েটার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিল। মুখের কাপড়ও সরিয়ে দিল একজন। কামরায় আলোর ব্যবস্থা করা হলো। মেয়েটা তিন খৃস্টান বণিকের লাশগুলোর দিকে অপলক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। লাশগুলো যেন তাকে বোবা করে ফেলেছে। একটু পর মেয়েটি লাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে বললো, 'আমাকে অন্য কামরায় নিয়ে চলো। এখানে আমার বমি আসছে।'

তাকে অন্য কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানেও টিমটিম করে জ্বলছিল এক প্রদীপ।

'তোমরা কি কখনও আমার মত এমন রূপসী নারী আর কোথাও দেখেছো?' পাশের কামরায় গিয়ে মেয়েটি তাদের জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি কি আমাদের মত এমন ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান মানুষ আর কোথাও দেখেছো?' ইবনে খতিব পাল্টা প্রশ্ন করলো মেয়েটিকে। বললো, 'আমরা তোমাকে আমাদের ঈমান নষ্ট করার সুযোগ আর দেবো না।'

'আমি তোমাদের কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি।' মেয়েটি বললো, 'যদি তোমরা আমাকে পছন্দ না করো তবে কতো সোনা দাবী করো বলো, আমি তোমাদের দাবী মিটিয়ে দেবো। তোমরা আমার প্রাণ ভিক্ষা দিলে আমি ওয়াদা করছি, এক মুহূর্তও আমি এখানে থাকবো না, সাথে সাথে জেরুজালেম রওনা হয়ে যাবো।'

মেয়েটির প্রস্তাব শুনে খতিব সাথীদের দিকে তাকালো। সাথীদের চোখেও সে লক্ষ্য করলো লোভের পরিবর্তে ঈমানী দৃঢ়তা। তাদের চোখগুলো ইবনে খতিবকে বলছে, কথা বলে সময় নষ্ট করছো কেন? যদি তার কাছ থেকে কিছু জানার থাকে জিজ্ঞেস করো। নইলে শেষ করে দাও।

ইবনে খতিব তার খঞ্জর বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল এবং তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তৎক্ষনাৎ তার বুকে বসিয়ে দিল হাতের খঞ্জর। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মেয়েটি। ইবনে খতিব তার খঞ্জর টেনে বের করে সঙ্গীর দিকে ইশারা করলো। দু'জন এগিয়ে মেয়েটির চুল ধরে টেনে অন্য কামরায় নিয়ে গেল এবং আগের সেই গর্তে খৃস্টান বণিকদের লাশের ওপর ফেলে দিল তার লাশ। তারপর সবাই মিলে গর্তটা মাটি চাপা দিয়ে ভরে দিল।

রাত তখনো শেষ হয়নি, ইমাম সাহেবকে জানানো হলো, 'কাজ সমাধা করা হয়েছে।'

এদিকে আস সালেহ তখন তিন বণিক ও মেয়েটিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে না পেয়ে তাদের খুঁজে ফিরছিলেন। তিনি মহলের কর্মচারী ও বাঁদীদের বলছিলেন, 'ওদেরকে অনুষ্ঠান

স্থলে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা কোথায় খুঁজে বের করো।'

রাতের শেষ প্রহর। শেষ মেহমানটিও বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আস সালেহ গভীর একাকীত্ব অনুভব করলেন। তিনি তার অন্তরঙ্গ সাথীদের জিজ্ঞেস করছিলেন, 'সে কোথায়? সে আজ একটি বারও দেখা করলো না আমার সাথে! যাকে আনন্দ দেয়ার জন্য এ অনুষ্ঠান, আনন্দের মাহফিলে সেই নেই, এ কেমন কথা!'

সঙ্গীরা বলছিল, 'এত হাঙ্গামা হয়তো সইতে পারেনি। ভাল লাগেনি বলে মহলে ফিরে গেছে। মহলেই আছে কোথাও, খুঁজে দেখুন।'

বন্ধুরাও বিদায় নিল। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল মহল। কিন্তু না, কোথাও নেই সে মেয়ে।

মেয়েটির জন্য অধীর হয়ে উঠলেন আস সালেহ। তিনি তার দাসীদের জানটা খেয়ে ফেলছিলেন রাগ, গোস্বা আর ধমকের দাপটে।

অবশিষ্ট রাতটুকু না তিনি নিজে ঘুমোলেন, না কাউকেও শুতে দিলেন।

ভোরে দাসী ইমাম সাহেবকে জানাল, 'মেয়েটিকে হারিয়ে আস সালেহের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তিনি এখন পাগলের মত প্রলাপ বকছেন।'

ইমাম সাহেব ইবনে খতিবকে খোঁজ নিতে বললেন। ইবনে খতিব খবর নিয়ে দেখলেন, দাসীর মন্তব্যই ঠিক। সত্যি তিনি পাগলের মত প্রলাপ বকছেন আর মহলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করছেন।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৩

ইহুদী কন্যা

ক্রুসেড-২২

হেমসের যোদ্ধা

আসাদ বিন হাফিজ